বিদেশের

চিরনূতন কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
৫/১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক
শংকর প্রেস
৩৭'১।১ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

—: উৎসর্গ :—

শ্রীকেশব দে ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস
যুগল বন্ধুর করকমলে

শুভার্থী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাইবেল-এর গল্প

[জগতের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রিত বই। দি হোলি বাইবেলের রচয়িতা প্রধাণত তিনজন, ম্যাথিউ,—মার্ক এবং লিউক। ৫৭ বা ৫৮ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। বাইবেলের মধ্যে বহু কাহিনী আছে। তারই একটি কাহিনী পরিবেশিত হ'ল।]

॥ এক ॥

সততা আর অধ্যবসায় থাকলে মানুষ তার কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করবে নিশ্চিত। এই গল্পের নায়ক জোসেফ-এর জীবন-কাহিনীতে সেই সত্যই উদ্‌ঘাটিত।

জোসেফরা বারো ভাই। জোসেফই জ্যেষ্ঠ এবং পিতা জেকবের সবচেয়ে প্রিয়। বাপের প্রিয় হবার মতো সব গুণই তাঁর ছিল। অন্য ভাই-এরা ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের স্বভাব হিংসুটে, সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। বড় ভাইএর প্রতিও দের বিদ্বেষের অন্ত ছিল না।

স জেকব একদিন জোসেফকে একটি চমৎকার পোষাক কিনে দিলেন। কানা দেখে অন্য ভায়েদের কী হিংসা!

—এঃ। যেন রাজপুত্র! বাপ তাঁর বড় ছেলেকে রাজপুত্তুর যখন য়েছেন।

ছিল জোসেফ কিন্তু ভায়েদের সঙ্গে কখনো কোন মন্দ ব্যবহার করত না। সে দুটি স্বপ্ন দেখল এবং ভায়েদের সেই স্বপ্ন দুটির কথা আমর

প্রথম স্বপ্ন হল সকল ভাই মিলে এক আঁটি শস্য বাঁধল। তাদের মধ্যে জোসেফ-এর আঁটিটাই দাঁড়িয়ে রইল। অন্য সকলের আঁটি মাটিতে পড়ে গেল। যেন তাঁরা জোসেফের আঁটিকে প্রণাম করছে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন হল—জোসেফ যেন একলা আছে। স্বর্গ থেকে সূর্য চন্দ্র আর এগারোটা নক্ষত্র এসে তাকে প্রণাম করছে।

ভায়েরা তাদের কূটবুদ্ধি দিয়ে স্বপ্ন দুটির বিকৃত অর্থ করল। প্রথম স্বপ্নের অর্থ তারা করল, যেন তারা সকলে জোসেফকে মেনে চলে। দ্বিতীয়টির অর্থ করল, তাদের বাপ মা আর এগারো ভাই যেন জোসেফ-এর কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

এই রকম অর্থ করে তারা জোসেফের উপর ভয়ানক রেগে গেল। বাপের আসকারা পেয়ে বড় ভায়ের অহংকার যেন আকাশ ছাপিয়ে উঠেছে। যেমন করে হোক তার এই অহংকার চূর্ণ করতে হবে। তারা নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

ছোট ভাই বিন্যামিন ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাছাড়া সে জানতো, ভায়েদের মধ্যে জোসেফ তাকেই সবচেয়ে ভালবাসে। তাই সে সেই সব ষড়যন্ত্রের সামিল হল না। কিন্তু সে একা। অন্য সব ভায়েদের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারবে কেন?

কয়েক মাস পরে দেশে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। খরায় পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। মাঠে ঘাসের পশুপালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তাই বাধ্য হয়ে এগারোজন ভাই পশুপাল নিয়ে জল সন্ধানে রওনা হল। জোসেফ রইল বৃদ্ধ পিতার কাছে।

অনেক দিন কেটে গেল। ছেলেদের কোন খবর জেকব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি জোসেফকে পাঠালেন।

তাদে
তাই
সাজি
জে
একদিন
বলল।

ঘুরতে ঘুরতে জোসেফ ভায়েদের সন্ধান পেল। কিন্তু তাকে দেখে ভায়েরা মোটেই খুশী হল না। বরং তাকে একা পেয়ে কী করে জব্দ করা যায় তার ফন্দী আঁটতে লাগল।

একজন বললে, রাতের বেলা ও যখন ঘুমুবে তখন ওকে কেটে ফেল।

আর একজন বললে, না, না। কেটে কাজ নেই। তার চেয়ে ওকে, ওই যে তাঁবুর পিছনে মস্ত বড় গর্তটা আছে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হোক। তাহলে গর্ত থেকে ও উঠতে পারবে না, আর না খেয়ে মরবে।

সকলেই সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে এবং রাত্রে ঘুমন্ত জোসেফকে সকলে মিলে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিলে।

পরদিন সকালে সেখানে উটের পিঠে চড়ে একদল বণিক এলো। তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জিনিষ কেনা-বেচা করতে চলেছে। তারা নানা রকম জিনিষপত্রের সঙ্গে দাস-দাসী ও ক্রয় বিক্রয় করে।

জোসেফ-এর এক ভাই ভাবল, জোসেফ যদি গর্তে পড়ে মারা যায় তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে ওকে যদি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদেরও কিছু টাকা লাভ হবে আর জোসেফও কোন দিন ফিরে আসতে পারবে না।

সে অন্য ভায়েদের তার অভিমত জানাল। ভায়েরা তার কথা সমর্থন করল এবং বণিকদের অপেক্ষা করতে বলে তারা সেই গর্তের কাছে গেল।

সারা রাত ধরে জোসেফ মড়ার মতো গর্তে পড়ে আছে। ভায়েরা যখন তাকে টেনে তুলল তখন তার গায়ে আর এতটুকুও শক্তি ছিল না।

ভায়েরা তাকে টেনে নিয়ে গেল বণিকদের কাছে। বললে, একে আমরা বিক্রি করতে চাই।

জোসেফ এর কাহিল শরীরের অবস্থা দেখে বণিকরা বেশি দাম দিতে চাইল না। মাত্র কুড়িটি মুদ্রা দিয়ে তারা জোসেফকে কিনে নিয়ে চলে গেল।

জোসেফ বিস্তর আপত্তি করেছিল। বলেছিল, তাকে এভাবে বিক্রি করবার কোন অধিকার ভায়েদের নেই। কিন্তু কে শোনে তার কথা। বণিকরা তার দামী পোষাকটা খুলে ফেলে দিয়ে তাকে উটের পিঠে চড়িয়ে হাটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ভায়েরা তখন একটা ছাগল কেটে তার রক্ত দিয়ে জোসেফ-এর পোষাকটাকে রাঙাল এবং সেই রক্তমাখা পোষাকটা নিয়ে গিয়ে তাদের বাপকে দেখালো।

জেকব জানলেন, কোন বন্য জন্তু জোসেফকে খেয়ে ফেলেছে। প্রিয় পুত্রের শোকে তিনি বহুক্ষণ ধরে আর্তনাদ করলেন।

॥ দুই ॥

জোসেফ বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পালাবার কোন উপায় নেই, সব সময় তার চারদিকে কড়া পাহারা।

দু'চার দিনের মধ্যেই বণিকরা বুঝেছিল, যুবকটি খুবই বুদ্ধিমান এবং কাজের। তারা ঠিক করল, কোন ছোটখাটো হাটে নয়, একে মিশরের বড় হাটে চড়া দামে বিক্রি করতে হবে।

এই ভেবে সারা পথই তারা জোসেফকে খুব তোয়াজে আর আরামে রাখল। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই জোসেফএর স্বাস্থ্য ফিরে গেল। সে দিন দিন আরও সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে তারা মিশরের হাটে পৌঁছল। সেখানে সেখানকার কারারক্ষী সেনাপতি জোসেফকে দেখে খুব পছন্দ করলেন এবং তাকে কিনে নিলেন।

সেনাপতির অনেক ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর মধ্যে জোসেফও একজন হয়ে রইল। সে তাদের সঙ্গেই থাকে, কাজকর্ম করে, নিজের কাজে অবহেলা করে না।

কিছুদিন পরে প্রধান ক্রীতদাস বুঝল, জোসেফ যেমন বুদ্ধিমান তেমনি পরিশ্রমী। সে জোসেফকে আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে লাগল। এবং জোসেফও তার কর্তব্য সুচারুরূপে দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে লাগল।

প্রধান ক্রীতদাস খুসী হয়ে একদিন সেনাপতির কাছে জোসেফের খুব প্রশংসা করল। শুনে সেনাপতি তাকে নিজের বাড়ির প্রধান পরিচারকের পদে নিযুক্ত করলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই নিজের কর্মদক্ষতার গুণে জোসেফ সেনাপতির গৃহস্থালীর সর্বাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হল। সেনাপতির টাকা পয়সা আর হিসাব পত্র রাখার ভারও তার উপর পড়ল।

জোসেফের কাজে সেনাপতি নিজে খুব খুসী ছিলেন। কিন্তু খুসী ছিলেন না তাঁর স্ত্রী। তিনি কেন জানিনা জোসেফকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। নানা অছিলায় তিনি তার নিন্দা করতেন এবং স্বামীর কাছে তার বিরুদ্ধে নানাকথা বলতেন।

শুনে শুনে সেনাপতিও জোসেফের প্রতি বিরূপ হলেন এবং একদিন সামান্য একটা কারণে তিনি তার উপর বিষম রেগে গিয়ে স্ত্রীর কথায় তাকে তাঁর গৃহসংলগ্ন কারাগারে আটকে রাখলেন।

বন্দীশালায় জোসেফের দিন কাটে। হঠাৎ কোথা থেকে একী হল! যাই হোক শান্ত মনে সে কারাগারে দিন যাপন করতে লাগল। ভগবানের উপর সে বিশ্বাস হারালো না। তার মনে এই আশা ছিল যে সে আবার সুদিনের মুখ দেখবে।

সেই কারাগারে তার দু'জন সঙ্গী জুটল। একজন হল, মিশরের রাজার পাচক, অন্যজন পরিবেশক। তাদের রান্না করা আর পরিবেশন

করা খাবার খেয়ে রাজার অসুখ করেছিল তাই রাজার ধারণা হয়েছিল যে তাদের মধ্যে কেউ খাবারে বিষ মিশিয়েছে।

সেনাপতি ওই দুজন কয়েদীর দেখা শোনার ভার দিলেন জোসেফের উপর। তাই জোসেফের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মালো।

একদিন পাচক এবং পরিবেশক দুজনেই গুম্ হয়ে বসে আছে দেখে জোসেফ বললে—কি হে! আজ তোমাদের কী হল। অমন চুপচাপ কেন?

দুজনেই বললে যে গতরাত্রে তারা দু'জনে স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু তার কী অর্থ তা তারা বুঝতে পারছে না।

জোসেফ বললে—তাই নাকি! তা, কি স্বপ্ন দেখলে শুনি।

পরিবেশক বললে আমি স্বপ্ন দেখেছি তিনটি আঙ্গুরলতা। তাতে ফুল হল, ফল হল এবং ফল পাকলো। তারপর আমি সেই আঙ্গুরের রস নিয়ে দিলাম ফারাওকে।

মিশরের রাজাকে বলা হয় ফারাও।

কিছুক্ষণ ভেবে জোসেফ স্বপ্নের অর্থ বললে—ফারাও তিনদিনের মধ্যে তোমাকে মুক্তি দেবেন এবং তুমি আগের মতোই তাঁর পরিবেশকের কাজ করবে।

তারপর জোসেফ সেই পরিবেশককে অনুরোধ করল, মুক্তি পেয়ে পরিবেশক যেন জোসেফের জন্যে ফারাওকে একটু অনুরোধ করে।

পরিবেশক সানন্দে স্বীকার করল। জোসেফের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই রাজার কাছে তার মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাবে।

এবার পাচক বললে তার স্বপ্ন—আমার মাথায় তিনটে ডালায় ফারাওর জন্যে রাখা অনেক খাবার ছিল। পাখীরা আমার ডালার সব খাবার খেয়ে ফেললো।

একটু চিন্তা করে জোসেফ বললে—খুবই দুঃস্বপ্ন। তিনদিনের মধ্যে ফারাও তোমার দেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখবেন আর পাখীরা তোমার মাংস খুঁটে খুঁটে খাবে।

তিনদিনের দিনই জোসেফের কথা সত্য হল।

ফারাও তাঁর জন্মদিনে পরিবেশককে মুক্তি দিয়ে আবার তাকে কাজে নিযুক্ত করলেন এবং পাচকের ফাঁসীর আদেশ দিলেন।

॥ তিন ॥

কারাগারে বসে জোসেফ ভাবছে, এইবার বুঝি রাজার দূত এসে তাকে মুক্ত করে দেবে।

কিন্তু কোথায় রাজার দূত! দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলে গেল, রাজার দূত এলো না। পরিবেশক জোসেফ এর কথা ভুলে গিয়েছিল।

এক রাত্রে ফারাও ছুটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন ছুটি তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করল। হঠাৎ এমন ছুটো অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি কেন দেখলেন আর স্বপ্ন ছুটোর অর্থই বা কী!

তিনি মন্ত্রীদের ডেকে স্বপ্ন ছুটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তারা কেউই বলতে পারল না।

স্বপ্নের কথা শুনে হঠাৎ পরিবেশকের মনে পড়ে গেল জোসেফকে। তাই তো, সেই লোকটার কথা সে একেবারেই ভুলে গিছল।

পরিবেশক ফারাওকে জানালো, রক্ষী সেনাপতির বন্দীশালায় জোসেফ নামে এক ক্রীতদাস আছে, স্বপ্ন সম্বন্ধে তার অদ্ভুত জ্ঞান, সে যে কোন স্বপ্নের অর্থ নির্ভুল বলে দিতে পারে।

এই বলে পরিবেশক তার ও পাচকের স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজাকে জানাল।

শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ জোসেফকে নিয়ে আসবার জন্যে দূত পাঠালেন। সংবাদ শুনে সেনাপতি তাড়াতাড়ি জোসেফকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে ভাল জামাকাপড় পরিয়ে দিলেন। জোসেফ দূতের সঙ্গে রাজভবন অভিমুখে রওনা হল।

যথাসময়ে ফারাওর সামনে তাকে উপস্থিত করা হল।

ফারাও তার সঙ্গে দু'চার কথার পর স্বপ্নের কথা তুললেন, বললেন শুনলাম, তুমি নাকি স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা করতে পারো। বল দেখি আমার স্বপ্ন দুটোর অর্থ কি?

এই বলে তিনি তাঁর স্বপ্ন দুটি শোনালেন।

প্রথম প্রশ্ন হল—একদিন ফারাও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় নদী থেকে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গাভী উঠে এসে মাঠে চরতে লাগল। তারপরই আবার সাতটা রোগা-পট্‌কা গাভী নদী থেকে উঠে আগেকার হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে খেয়ে ফেললো।

দ্বিতীয় স্বপ্ন—একটা বোঁটায় সাতটা মোটা শীষ উঠল। তার পরেই সাতটা সরু শীষ। সরু শীষগুলো মোটা শীষগুলোকে খেয়ে ফেললো।

স্বপ্নের কাহিনী বলে ফারাও জোসেফকে প্রশ্ন করলেন – এর মানে বলতে পারো?

ঘাড় নেড়ে জোসেফ বললে—পারি সম্রাট! তবে একটু সময় চাই।

—বেশ, সময় দিলাম।

আধ ঘণ্টা ধরে ভাবল জোসেফ। তারপর বললে— সম্রাট, আপনার দুটি স্বপ্নেরই এক অর্থ। এখন পর পর সাত বছর খুব ভাল ফসল হবে, তারপর আর সাত বছর হবে ভীষণ অজন্মা, ফলে দুর্ভিক্ষ। আর এটা যে হবে তা বোঝানোর জন্যেই ভগবান দু'বার করে স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

ফারাও বললে যদি তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে এখন করণীয় কি?

জোসেফ বললে—একজন বুদ্ধিমান সৎ এবং পরিশ্রমী মানুষ খুঁজে বার করুন যিনি প্রথম সাত বছরের বাড়তি ফসল দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চয় করে রাখবেন, যাতে দুর্ভিক্ষের সাত বছরেও লোকের কোন কষ্ট না হয়।

রাজা তখন মন্ত্রীদের ডেকে জোসেফের কথা বলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলেন। তারপর জোসেফকে বললেন তোমাকেই আমি এই কাজের ভার দিলাম। এখন থেকে তুমিও আমার একজন মন্ত্রী।

এই বলে ফারাও তাকে মন্ত্রীর পোষাক দিলেন এবং তার হাতে নতুন আংটি আর গলায় সোনার হার দিয়ে তাকে সম্মানিত করলেন। তার নতুন নামকরণও হল।

ফারাওর রথে চেপে নতুন মন্ত্রী নগর পরিদর্শনে বেরুলো। রাস্তার লোক তাকে দেখে শান্ত হয়ে অভিবাদন জানালো।

সতেরো বছর বয়সে জোসেফ ক্রীতদাস হয়েছিল। ত্রিশ বছর বয়সে মিশর রাজ্যের মন্ত্রী হল। ভাগ্যচক্রের কী অদ্ভুত পরিবর্তন।

পরের বছর প্রচুর ফসল জন্মালো। লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা ফসল উদ্বৃত্ত হল জোসেফ সতর্ক ব্যবস্থাপনার দ্বারা সেই ফসল গোলায় তুলে রাখল। এই ভাবে পর পর সাত বছর জোসেফ বাড়তি ফসলে গোলার পর গোলা ভর্তি করতে লাগল।

তারপর সত্যিই এলো সেই দুর্ভিক্ষের কাল। বোঝা গেল, জোসেফের প্রথম সাত বছরের ভবিষ্যদ্বাণী যখন সফল হয়েছে তখন পরের সাত বছরের ভবিষ্যদ্বাণীও ব্যর্থ হবে না। সাত বছর ধরে চলবে অজন্মা।

রাজ্যের লোক ফারাওর কাছে এসে খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা জানাতে লাগল। তিনি তাদের মন্ত্রী জোসেফের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

দলে দলে প্রজারা জোসেফের কাছে আসতে লাগল। জোসেফ বললে, তোমাদের কোন ভয় নেই। সবাইকার জন্যে খাদ্য মজুত আছে। ন্যায্য দাম দিয়ে নিয়ে যাও।

রাজভাণ্ডার খুলে দিয়ে গোলার পর গোলা থেকে জোসেফ শস্য বিক্রয় করতে লাগল। প্রজারা তার নামে জয়ধ্বনি দিল। দিনের পর দিন বছরেব পর বছর প্রজাদের খাদ্যের অভাব ঘটল না।

জোসেফের বিচক্ষণতা আর সংগঠন ক্ষমতা দেখে ফারাও শুধু নন,

রাজ্যের সমস্ত অমাত্য পরিষদ অবাক হয়ে গেল। সর্ববাদীসম্মত ভাবে জোসেফকে ফারাও প্রধানমন্ত্রীর পদ দিলেন।

যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এত দিন, তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে জোসেফকে ঐ পদ প্রদান করে রাজকর্ম থেকে অবসর নিলেন।

। চার ॥

জোসেফের পিতা আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। জোসেফকে হারাবার পর কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। জেকব বা তাঁর অন্য ছেলেরা কেউ ভাবতেও পারে নি যে জোসেফ আজো বেঁচে আছে।

লোক মুখে জেকবের ছেলেরা খবর পেল যে মিশরে প্রচুর শস্য পাওয়া যাচ্ছে। তাদের গ্রামেও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। তাই তারা দশজনে মিলে ফসল কিনতে মিশরে এলো। ছোট ভাই বিন্যামিন রইল বাপের কাছে।

সেখানে তারা জোসেফকে দেখল কিন্তু চিনতে পারল না। এই কয়েক বছরে জোসেফের চেহারা একদম বদলে গেছে। তার চালচলন পোষাক পরিচ্ছদ সবই অন্য রকম। তাছাড়া ভায়েরা তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে জোসেফ মিশরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে!

জোসেফ তার ভায়েদের দেখেই চিনতে পেরেছিল। কিন্তু সে তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলে না। ববং সে তাদের সঙ্গে বিদেশীদের মত ব্যবহার করল।

তাদেব মতিগতি এতদিনে কেমন হয়েছে তা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জোসেফ তাদেব উপর চটে যাওয়ার ভান করে বললে—তোমরা বিদেশী রাজার চর, নিশ্চয় আমাদের শত্রুতা করতে এসেছো।

তারা সকলে কাকুতি মিনতি করে নিজেদের পরিচয় দিলে এবং সব কথা খুলে বললে। জোসেফ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের বাড়ির সব

খবর নিলে। তবু যেন তাদের কথা বিশ্বাস করলে না—এই ভাব দেখিয়ে তাদের তিনদিনের জন্যে নিজের প্রাসাদ সংলগ্ন কারাগারে আটকে রেখে দিলে। আসলে জোসেফ বুঝতে চাইছিল, ভায়েরা সেই রকমই বদ স্বভাবের আছে না তাদের চরিত্র শুধরেছে।

কারাগারে বসে ভায়েরা ভাবতে লাগল, মন্ত্রী নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করবে। তারা অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

তিন দিন পরে জোসেফ তাদের ডেকে আনল। তারা সামনে এসে দাঁড়ালো।

জোসেফ বললে—তোমরা যদি সৎলোক হও তাহলে তোমাদের একজন জামিনস্বরূপ আমার বন্দীশালায় থাক আর অন্যরা দাম দিয়ে ফসল নিয়ে যাও। তারপর তোমাদের ছোট ভাইকে নিয়ে আসবে। যদি না আস তাহলে তোমাদের বন্দী ভাইকে আমি ছাড়ব না।

নিরুপায় হয়ে তারা জোসেফের কথায় রাজী হল. শিমোয়ান নামে তাদের এক ভাই কারাগারে রইল. অন্য সকলে এক এক থলে ফসল নিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে রওনা হল। পথে তারা থলে খুলে দেখল, ফসলের সঙ্গে তাদের দেওয়া ফসলের দামও থলের মধ্যে রয়েছে।

এই দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। মনে মনে ভয়ও পেল। কি জানি তারা আবার কোন্ নতুন বিপদে পড়বে।

ঘরে ফিরে গিয়ে তাদের বাবাকে ঘটনা সব বললে।

জেকব যখন শুনলেন যে তাঁর ছোট ছেলেটিকে সেখানে যেতে হবে, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। বললেন জোসেফ গেছে, শিমোয়ানও গেল. আবার বিন্যাবিনকেও হারাবো! না, না, তা হতেই পারে না। আমি ওকে যেতে দেব না।

ছেলেরা চুপ করে রইল। কেটে গেল কিছুদিন। ইতিমধ্যে যে ফসল তারা এনেছিল তা শেষ হয়ে গেল। তখন জেকব শস্য আনতে ছেলেদের আবার মিশরে যেতে বললেন। কিন্তু তারা ছোট ভাইকে সঙ্গে না নিয়ে যেতে সাহস পেল না।

জেকব তখন বাধ্য হয়েই ছোট ছেলেকে অন্য ছেলেদের সঙ্গে পাঠালেন। তারা থলের মধ্যে যে টাকাগুলো পেয়েছিল তাও সঙ্গে নিল।

অন্য দিনের মতো প্রার্থীদের শস্য দিতে এসে জোসেফ দেখল তার ভাইএরা এসেছে এবং বিন্যামিনও রয়েছে তাদের মধ্যে। প্রিয় ভাইটিকে দেখে জোসেফ মনে মনে খুব আনন্দিত হল।

ভায়েদের মধ্যে একজন তার কাছে এগিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে থলের মধ্যে পাওয়া টাকাগুলি ফেরৎ দিল। তখন জোসেফ আরও খুশী হল। সে বুঝলো, ভায়েরা সত্যিই এখন সৎ হয়েছে।

সে তাদের সকলকে ডেকে ভোজ খাওয়ালো এবং থলে ভর্তি করে শস্য দিয়ে তাদের বিদায় করল।

ভায়েদের আনন্দ আর ধরে না, প্রধানমন্ত্রী তাদের ভাইকে আটক রাখলেন না, শিমোয়ানকেও ছেড়ে দিলেন। কী আনন্দ সকলকার! তার উপর থলে ভরতি ফসল! মনের আনন্দে তারা বাড়ীমুখো হল।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই ফারাওর সেপাই এসে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। প্রধানমন্ত্রীর রূপোর বাটি পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সেপাই সকলের থলে তল্লাস করে দেখবে।

একে একে সকলের থলে খুঁজে দেখা হল, কিন্তু রূপোর বাটি পাওয়া গেল না। শেষে যখন বিন্যামিনের থলে খোলা হল তখন দেখা গেল তার মধ্যে রূপোর বাটি রয়েছে।

বিন্যামিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক! সে যে কিছুই জানে না। কি করে রূপোর বাটি তার থলের মধ্যে এলো? অন্য সব ভাই মনে মনে প্রমাদ গণল। শেষে এই ছিল তাদের ছোট ভায়ের কপালে! চোর অপবাদে তাকে নিশ্চয়ই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

ফারাওএর সেপাই সবাইকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধরে নিয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী ঘটনা শুনে বললে—চুরির অপরাধে বিন্যামিনকে চিরজীবন এখানে ক্রীতদাসরূপে কাটাতে হবে।

ভায়েদের মধ্যে যে ভাই জোসেফকে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেবার মতলব দিয়েছিল সে তখন এগিয়ে এসে বলল—প্রভু! বিন্যামিন আমাদের বড় আদরের ছোট ভাই।

তাছাড়া আমাদের বাবা বড় ভাইকে হারাবার পর এই ছোট ভাইটিকেই সব সময় কাছে রাখেন।

ওকে আটকে রাখলে আমাদের বুড়ো বাবা আর বাঁচবেন না। আপনি ওকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

ওর বদলে আমি সারাজীবন আপনার দাস হয়ে কাটাবো।

তার কথা শুনে জোসেফের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হল! ঠিক এই কথাই তো সে শুনতে চাইছিল।

সে বুঝলো, ভায়েদের চরিত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তারা যে শুধু টাকাই ফেরৎ দিয়েছে তাই নয়, তারা বাপের দুঃখ বুঝতে শিখেছে, তারা আত্মত্যাগ করতে শিখেছে।

তখন জোসেফ ভায়েদের কাছে নিজের পরিচয় দিল।

জোসেফের কথা শুনে ভায়েরা বিহ্বল হল। একী তারা স্বপ্ন দেখছে?

না, স্বপ্ন তো নয়! এইতো সত্যিই তাদের বড় ভাই জোসেফ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন তারা তাকে একেবারেই চিনতে পারেনি! আনন্দে ও বিস্ময়ে তাদের মুখে কোন কথা জোগালো না।

ফারাওর কাছে খবর গেল, প্রধানমন্ত্রীর ভায়েরা এসেছে।

তিনি তাদের ডেকে অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন।

তাদের বাবার খবর শুনে বললেন—তোমাদের পিতা, দাস দাসী আর পশুপালকে এখানে নিয়ে এসো এবং নিশ্চিন্ত মনে আমার রাজ্যে বাস কর।

ভায়েরা ফিরে গিয়ে জেকবকে সব কথা জানালো।

জেকব তো প্রথমে ছেলেদের কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তারপর ছেলেদের সঙ্গে এলেন মিশরে।

জোসেফ যখন আভূমি প্রণত হয়ে পিতাকে অভিবাদন জানাল তখন বৃদ্ধ জেকব ভাবের আবেগে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর প্রিয়তম পুত্রকে, তাঁর হারানো রত্নকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

খবর পেয়ে ফারাও এসে দাড়ালেন

সেই আবেগময় দৃশ্য দেখে তিনি অভিভূত হলেন।

তারপর বৃদ্ধ জেকবকে সসম্মানে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন—জোসেফ-এর মতো ছেলের জন্ম দিয়েছেন বলে আপনি গর্ব বোধ করতে পারেন।

আজ থেকে আপনি আমার রাজ্যের একজন মাননীয় প্রজা। আপনি এই রাজ্যেই বাস করুন, তাতে আমি কৃতার্থ বোধ করব।

জেকব সানন্দে সম্মত হলেন এবং ছেলেদের নিয়ে নতুন রাজ্যে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন।

———

রবিনসন ক্রুশো * ডি ফো

একটি বই লিখে চিরকালের জন্যে অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জন করেছেন, পৃথিবীতে এমন লেখক বিরল। সেই বিরলতম লেখকদের অন্যতম হলেন ড্যানিয়েল ডিফো। সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে লণ্ডন শহরে তাঁর জন্ম। দেশবিদেশের অনেক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তিনি পড়েছিলেন এবং যৌবন কালেই "রবিনসন ক্রুশো" লিখেছিলেন। বইটি প্রথমে ইংলণ্ডে তারপর পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, বইটির কত লক্ষ কপি যে বিক্রয় হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শেষ জীবনে ডি ফো নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় মারা যান। মানুষের মনে যদি সাহস থাকে, উদ্যম অধ্যবসায় থাকে তাহলে মানুষ যে কোন অবস্থায় যে কোন বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে, রবিনসন ক্রুশোর অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে লেখক সেই কথাই বলতে চেয়েছেন।

॥ এক ॥

ইংলণ্ডের এক বনেদী পরিবারে একটি ছেলে জন্মালো তার নাম রাখা হল রবিনসন ক্রুশো। বাপ-মায়ের আদুরে ছেলে, বড়মানুষী চালে তার শিক্ষা দীক্ষা। বাপের ইচ্ছে ছেলে আইন পাশ করে উকিল হবে।

কিন্তু ছেলের মন অন্য দিকে। সারা দিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পারহীন দিগন্তের দিকে চেয়ে যেন কি ভাবে। সমুদ্র বুঝি তাকে ডাকে

ছেলেবেলা থেকেই দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াবার প্রবল ঝোঁক দেখা গিয়েছিল রবিনসনের মধ্যে। বিশেষ করে সমুদ্রে পাড়ি দেবার দুর্জয় বাসনা। বাপ মায়ের নিষেধ শুনলেন না। শেষ পর্যন্ত সামান্য টাকাকড়ি নিয়ে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লেন।

জাহাজ চেপে লণ্ডনে যাবার সময় পথে বিপদ ঘটল। তলা ফেঁসে গিয়ে জাহাজ ডুবে গেল। ভাগ্যক্রমে অন্য একটি জাহাজ এই দুর্ঘটনা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে রবিনসনও অন্য যাত্রীদের উদ্ধার করল।

যাত্রার সূচনাতেই বিপদ বিঘ্ন হতাশা। কিন্তু রবিনসন ক্রুশো দমবার পাত্র নয়। লণ্ডনে পৌঁছে জাহাজ আপিসে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন এবং শিগগিরই এক জাহাজের মালিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন। তাঁর জাহাজ-ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই তিনি উপকূলে যান। তিনি রবিনসনকে পরামর্শ দিয়েছেন রবিনসন যদি কিছু মনিহারী জিনিষ নিয়ে তাঁর সঙ্গে গিনি উপকূলে যান তাহলে মোটা লাভ করতে পারবেন। কারণ সেখানে মনিহারী জিনিষের খুব চাহিদা।

রবিনসন তো এই চান! ব্যবসা হোক বা না হোক, সমুদ্র বেড়ানতো হবে। এযে তাঁর আজন্মের সাধ! আত্মীয়স্বজনের কাছে ধর্ণা দিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করলেন। সেই টাকা দিয়ে কিনলেন সস্তা দামের খেলনা, পুঁতির মালা, কাঁচের জিনিষ, আরও সব টুকিটাকি মনিহারী দ্রব্য।

সমুদ্র যাত্রা সুরু হল। এবার ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পেঁছে জিনিষগুলো চড়া দামে বেচে অনেক টাকা লাভ করলেন রবিনসন। শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে জাহাজ চালানোও শিখে ফেললেন। তাঁর আনন্দ দেখে কে!

লণ্ডনে ফিরে এসে আরও জিনিষ সওদা করে আবার গিনি অভিমুখে পাড়ী দিলেন এবং সেখানে পৌঁছে দু'চার দিনের মধ্যেই সব মাল বিক্রয় করে অনেক টাকা পকেটে নিয়ে দেশে ফেরবার জন্যে জাহাজে উঠলেন।

এবার সমুদ্রের বুকে ঘটল এক বিপর্যয় কাণ্ড। যার ফলে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে গেল!

মাঝপথে হঠাৎ একদল মুর জলদস্যু তাঁদের জাহাজ আক্রমণ করল এবং জাহাজের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। তখন সে-অঞ্চলে ক্রীতদাস

প্রথা খুব চালু ছিল। জলদস্যুরা রবিনসন আর অন্য যাত্রীদের ক্রীতদাসরূপে বাজারে বিক্রি করে দিল। হঠাৎ কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! কোথায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, সে কিনা শেষকালে ক্রীতদাস! উপায় নেই। ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে!

রবিনসন ক্রীতদাসের জীবনে ভর্তি হলেন। বরাতক্রমে তাঁর মনিবটি ছিল বড় ভাল। সে রবিনসনের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করতে লাগল। ক্রীতদাসের ভাগ্যে এমন দয়া প্রায়ই ঘটেনা।

লোকটির মাছ ধরবার ছিল প্রবল নেশা। আর রবিনসন মাছ ধরায় ছিলেন ওস্তাদ।

কাজেই দুচার দিনের মধ্যেই মনিবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন রবিনসন। কিন্তু তাহলেও এভাবে এখানে তো থাকা যায় না। পালাতে হবে। কিন্তু কেমন করে পালাবেন? কোন উপায়ই তো রবিনসন দেখতে পাচ্ছেন না।

অবশেষে বছর দুই পরে সুযোগ পাওয়া গেল। তাঁরই সমবয়সী একটা মূর চাকরকে নিয়ে তিনি একদিন একটা ছোট নৌকা করে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলেন।

খানিকটা দূরে গিয়ে রবিনসন ধাক্কা মেরে চাকরটাকে জলে ফেলে দিলেন এবং বন্দুক উঁচিয়ে তাকে সাঁতার দিয়ে ডাঙায় ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু চাকরটা গেলনা।

সে হাতজোড় করে তাঁকে জানালো যে, সে সর্বপ্রকারে রবিনসনকে সাহায্য করবে, সে তাঁর কাছেই থাকতে চায়। তার কথায় বিশ্বাস করে রবিনসন তাকে নৌকায় তুলে নিলেন।

কিন্তু কোন্ দিকে যাবেন? কোন্ তটে গিয়ে আশ্রয় মিলবে? নৌকায় সামান্য খাবার ছিল। এক রাত্রেই তা ফুরিয়ে গেল। অকূল সমুদ্রের মাঝখানে রবিনসনের মনে দিগন্ত জোড়া হতাশা ঘনিয়ে উঠল।

দু'দিন দু'রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটাবার পর রবিনসন দূরে একটা জাহাজ দেখতে পেলেন।

উল্লাসে অধীর হোয়ে হাত নেড়ে, গায়ের জামা খুলে সেটাকে নিশানের মত উড়িয়ে তিনি সেই জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জাহাজ ধীরে ধীরে তাঁর নৌকার কাছে এলো, তারপর জাহাজের কাপ্তেন রবিনসনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপার বুঝে নিয়ে তাঁকে এবং মূর চাকরটাকে নিজের জাহাজে তুলে নিলেন।

কাপ্তেনের জাহাজ ব্রাজিল অভিমুখে যাচ্ছিল।

সেখানে পৌছে তিনি রবিনসনকে নামিয়ে দিলেন। মূর ভৃত্যটি কাপ্তেনের কাছেই রয়ে গেল।

॥ দুই ॥

ব্রাজিলে রবিনসনের দিন ভালই কাটতে লাগল। উদ্যোগী যুবক ছিলেন তিনি। যেকোন অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো মনোবল তাঁর ছিল। তিনি সেখানে চাষবাস শুরু করে দিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেন।

কিন্তু মাথার পোকা আবার নড়ে উঠল। সমুদ্র আবার তাঁকে ডাকতে লাগল। তার উপর তাঁর ব্রাজিলের বন্ধুরাও তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

গিনি উপকূলে ব্যবসা করে যে লাভের পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন, সে-পথ তিনি ছাড়বেন কেন? তাঁরা তাঁকে গিনিতে গিয়ে মাল বিক্রি করবার পরামর্শ দিতে লাগলেন।

বেশি বলতে হল না। মনে মনে রবিনসন তো তাই চান! সঙ্গে সঙ্গে তোড়জোড় শুরু করলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে শুভলগ্ন দেখে বেরিয়ে পড়লেন।

দু'চার দিন বেশ ভালই কাটল। শান্ত সমুদ্র। অনুকূল বাতাস! জাহাজ স্বচ্ছন্দগতিতে লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলল। তারপরেই এলো মহা দুর্যোগ। প্রকৃতির রুদ্র রোষ যেন রবিনসনের জাহাজটার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। যেন নটরাজের প্রলয় নৃত্য সুরু হল। সেই ঝড়ের দাপটে রবিনসনের জাহাজ একটা চড়ায় গিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খেল। তার তলা চিরে গেল, জাহাজ ডুবতে লাগল। তখন রাত্রি নেমেছে।

রবিনসন এবং আরও কয়েকজন একটা নৌকা বাগিয়ে তার উপর চড়ে কোন রকমে কাছাকাছি ডাঙায় যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হঠাৎ এক পর্বতপ্রমাণ ঢেউ এসে নৌকা উল্টে দিল। রবিনসনের সঙ্গীরা সকলেই সেই প্রচণ্ড তরঙ্গ-রঙ্গে তলিয়ে গেল।

প্রাণপণে সাঁতার কেটে একা রবিনসন আধমরা অবস্থায় কোনমতে ডাঙায় পৌছলেন। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। নিশুতি রাত। দূরে শুধু সমুদ্রের গর্জন। চারিদিকে তাকালেন তিনি। কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার যেন হাঁ করে গিলতে আসছে! কাছাকাছি একটা বড় গাছ দেখে তিনি তার উপর উঠলেন। গাছের ডালে বসে রাত কেটে গেল।

ভোরের দিকে বোধহয় কিছুক্ষণের জন্যে ক্লান্ত হু'চোখে তন্দ্রা নেমেছিল। ধড়মড় করে জেগে তিনি দেখলেন, দুটো মোটা ডালের আশ্রয়ে তিনি এই অবস্থাতেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চারদিকে আলো। সকাল হয়েছে। ঝড় থেমে গেছে। আকাশ রৌদ্র কিরণে ঝলমল করছে। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য তাঁর নজরে পড়ল। ঝড়ের বেগে তাঁদের জাহাজটা প্রায় ডাঙায় উপর উঠে এসেছে।

গাছ থেকে তিনি নামলেন। খিদে আর তেষ্টায় শরীর অবশ, বিকল। কিছু না খেলে বেশিক্ষণ আর বেঁচে থাকা যাবে না। কিন্তু কোথায় আহার পাওয়া যায়? তাঁর মনে পড়ল জাহাজে অনেক খাবার আনা হয়েছিল। রুটি, মাখন, জ্যাম, শুকনো মাংস, পনীর, ফল ও কাঁচা তরকারী। সেগুলো কি এখনো আছে?

রবিনসন তীরে গিয়ে জাহাজের উপর উঠলেন। জাহাজের ভাঁড়ার

ঘরে ঢুকে তার দু'চোখ আনন্দে বিস্ফারিত হল। খাবারগুলো সবই ঠিক আছে, নষ্ট হয়নি। প্রথমে প্রাণভরে আহার করলেন। তারপর নিজে যে কেবিনটায় আসছিলেন তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

কেবিনের ভিতর তার জিনিষপত্র সবই রয়েছে। বন্দুকটা যেমন টাঙানো ছিল তেমনিই আছে। প্রথমেই বন্দুকটা নিয়ে কাঁধে বোঝালেন। কার্তুজও যা ছিল, নিলেন। তারপর জাহাজ থেকে খানকয়েক তক্তা এবং ছুতারের যন্ত্রপাতি নিয়ে সেই গাছের কাছে ফিরে এলেন।

শুরু করলেন একটা আস্তানা বানানোর কাজ। অনভ্যস্ত হাতে কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত সেখানে একটা চালাঘর বানিয়ে নিলেন।

ডেরা তো যাহয় একটা হল। খাবারদাবারও পাওয়া গেচে প্রচুর। এখন দেখা যাক, দ্বীপটার মধ্যে কি আছে, কারাই বা এখানে বাস করে। ধীরে ধীরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠলেন। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়। তাহলেও তার উপর উঠে তিনি সমস্ত দ্বীপ-টাকে দেখতে পেলেন।

চারিদিকে তাকিয়ে যা দেখলেন, তাতে তার মনটা বিলক্ষণ দমে গেল। কোথাও কোন বসতি নজরে পড়ল না। লোকজন কাউকে দেখা গেল না। শুধু নানা জাতের জন্তু-জানোয়ার ইতস্তত: ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব জন্তু জানোয়ার পরিবৃত হয়ে একা এই দ্বীপের মধ্যে কতদিন থাকতে হবে কে জানে। সহসা তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়ে উঠল।

কিন্তু অবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া তো গত্যন্তর নেই। ধীরে ধীরে রবিনসন নিজের নবনির্মিত আস্তানায় ফিরলেন। সে-রাতটা তার মধ্যে কাটিয়ে পরদিন সকালে স্থির করলেন, জাহাজ থেকে প্রয়োজনে লাগবার মতো যা পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আসা দরকার। তাদের দিয়ে তাঁর এই নতুন জীবনযাত্রায় অনেক কাজ হবে।

সেদিন থেকে প্রত্যহ ভাঁটার সময় তিনি জাহাজে উঠে যা কিছু কাজে লাগতে পারে সব নামিয়ে আনতে লাগলেন। বহু প্রয়োজনীয় জিনিস পেলেন। আরও আনতেন, কিন্তু চৌদ্দ দিনের দিন আবার প্রচণ্ড ঝড় উঠল এবং ভাঙা জাহাজখানা সেই ঝড়ের মুখে পড়ে সমুদ্রের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

জিনিস অনেক কিছুই সংগ্রহ করা গেল, কিন্তু তাদের রাখা যায় কোথায় এই হল তাঁর চিন্তা। অনেক অনুসন্ধানের পর যে পাহাড়ে তিনি প্রথম দিন উঠেছিলেন সেই পাহাড়ের একটা জায়গায় খানিকটা সমতল জমি আবিষ্কার করলেন। তার একদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে, সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন বন্য জন্তু আসবার সম্ভাবনা ছিল না। সেদিকটা পিছনের দেওয়াল করে সুমুখের তিন দিক তিনি একট অর্ধ চন্দ্রাকার বেড়া দিয়ে ঘিরলেন এবং একটা মই তৈরী করে তার সাহায্যে সেই উঁচু ঘর থেকে নীচে নামা-ওঠা করবার ব্যবস্থা করলেন। রাত হলে ঘরে ঢুকে মইটা তুলে নিতেন। যাতে কোন জন্তু জানোয়ার উপরে উঠতে না পারে সেজন্যেই এই আয়োজন করলেন।

তারপর জাহাজ থেকে আনা জিনিষপত্রগুলি একে একে এনে ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। বাসাটি মন্দ হল না। খাবার জায়গা, শোবার জায়গা, বসবার জায়গা, রীতিমতো যেন বড়লোকের হলঘর।

বাসা ঠিক করবার পর রবিনসন আসবাবপত্র তৈরী করতে লাগলেন। ছুতারের কাজ তো কোনদিন করেননি তাই খুবই কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে মনে করলেন না। প্রথমে একটা টেবিল, তারপর একটা চেয়ার, তারপর শোবার জন্যে একটা তক্তাপোষ। জাহাজ থেকে পাওয়া একটা শক্ত কাঠের তক্তা কেটে একটা কোদাল তৈরী করলেন। একটা লোহার পাতকে পিটিয়ে একটা কুড়ুলও তৈরী হল।

নিঃসঙ্গ নতুন পরিবেশে রবিনসন ক্রুশো নতুন জীবনযাত্রা শুরু করলেন।

।। তিন ।।

দিন কয়েক পরে মাটির দিকে চেয়ে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখলেন তিনি। জাহাজ থেকে যেসব জিনিষ এসেছিলেন তার ভিতর ছিল একটা বড় চটের নতুন থলি। থলির মধ্যে ছিল কতকগুলো তুঁষ।

থলিটা কাজে লাগবে তাই তিনি ঘরের বাইরে এনে তুষগুলোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে থলিটা খালি করে নিয়েছিলেন। তারপর সেকথা তাঁর আর মনে ছিল না। অল্প কয়েকদিন পরেই বর্ষা নেমেছিল। দিন কয়েক জল হবার পর রবিনসন দেখলেন যেখানে তুঁষগুলো ফেলা হয়েছিল সেখানে কতকগুলো অংকুর দেখা দিয়েছে।

অংকুর বড় হলে তিনি দেখলেন, কতকগুলো শিষ ধানের, কতকগুলো যবের। দেখে তার মনে খুব আনন্দ হল। কোদাল দিয়ে খানিকটা জমি চষে ঠিক করে নিলেন, তারপর ধান আর যবগুলো পেকে উঠলে সেগুলো আবার সেই চষা জমিতে ছড়িয়ে দিলেন। এইভাবে অনেক ধান আর যব পাওয়া গেল।

রুটি সেঁকবার জন্যে চাটু চাই। কাঠের যাঁতা বানালেন। একটা মাটির চাটু তৈরী করে সেটা আগুনে পুড়িয়ে নিলেন। দিব্যি রুটি তৈরী হোতে লাগল।

এবার পোষাক? জাহাজ থেকে এক প্রস্থ পোষাক পাওয়া গিছল। কিন্তু তা আর কতদিন চলবে। ছাগল মেরে তার চামড়া শুকিয়ে এক প্রকার পোষাক বানালেন তিনি। সে বড় অদ্ভুত পোষাক। একে একমুখ দাড়ি গোঁফ তার ওপর ওইরকম বিচিত্র পোষাক, তাঁর চেহারা যা হয়ে ছিল তা দেখে তাঁর দেশের মানুষরাও বোধ করি ভয় পেতো।

রবিনসনের বুদ্ধিমত্তার আর একটি পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার। প্রয়োজনহীন জগৎ-ছাড়া দ্বীপের মধ্যে বসেও তিনি মাস ও দিনের

দরকার

হিসাব রেখেছিলেন। যেদিন তাঁর জাহাজ ডুবি হয় সেদিন থেকে মাস ও তারিখ হিসাব করে দেওয়ালের গায়ে প্রতি মাস ও তারিখ লিখে ক্যালেন্ডারের মতো করলেন, তারপর প্রত্যহ সকালে উঠে এক একটা করে তারিখ কেটে দিতে লাগলেন।

॥ চার ॥

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। রবিনসন ক্রুশো যেন সেই দ্বীপের রাজা। যতদূর দৃষ্টি যায় সবটাই তাঁর রাজত্ব। প্রজা বলতে কয়েকটা কুকুর আর বিড়াল। তারা তাঁর খুব পোষ মেনেছিল। তিনি যখন টেবিলে বসে আহার করতেন তখন তারা সব প্রসাদ পাবার আশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতো।

একা একা জঙ্গলে টহল দিয়ে, ফল পেড়ে, সমুদ্রের কিনারায় মাছ ধরে দিন ভালই কাটছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপারে রবিনসন উদ্বেগ বোধ করলেন, ভয় পেলেন।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, সমুদ্রের ধারে বালির উপর একটা প্রকাণ্ড পায়ের ছাপ। তিনি বিহ্বল বোধ করলেন। এতদিন পরে হঠাৎ এ পায়ের ছাপ কোথা থেকে এল? চারদিক ঘুরে পাহাড়ের চূড়োয় উঠে অনেক খুঁজলেন কিন্তু কোথাও মানুষ দেখা গেল না। তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। দিনের বেলায় এক রকম কেটে যায়, কিন্তু রাত হলেই ভয় বাড়ে, ঘুমোতে পারেন না।

ঘরের চারধারে মজবুত বেড়া। কিন্তু তাতে আশ্বস্ত না হোয়ে আরও একটা বেড়া লাগালেন। ক্রমে তাঁর ভয়ের ভাবটা কমে গেল।

এমনি করে আরও বছর দুই কেটে গেল। তারপর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রবিনসন বাইরে এসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন সমুদ্রকূলে খান পাঁচেক নৌকা বাঁধা রয়েছে। ভাল করে সেখান থেকে যা দেখলেন তাতে সর্বশরীর যেন হীম হয়ে গেল।

পঁচিশ তিরিশ জন লোক একটা প্রকাণ্ড আগুনের চারদিকে নৃত্য করছে আর সেই সঙ্গে তাদের বিকট চিৎকারে সমুদ্রতীর যেন আলোড়িত হচ্ছে।

অন্যদিকে দৃষ্টি ফেলতেই রবিনসন সন্ত্রাসে দেখলেন, তীরের কাছে বাঁধা একটা নৌকা থেকে তারা তুজন লোককে টানতে টানতে সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিয়ে এলো, তারপর সকলে মিলে লোক তুটোকে বেদম প্রহার করল। একজন তো মারের চোটে বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।

প্রথম লোকটা যখন মার খাচ্ছিল তখন দ্বিতীয় লোকটা সুযোগ পেয়ে তাদের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক তাকে ধরবার জন্যে তার পিছনে ছুটলো। কিন্তু যে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে তার সঙ্গে তারা পারবে কেন?

রবিনসন সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রাণভয়ে ভীত লোকটা সেই দিকেই ছুটে আসছে।

যে তিনজন পিছনে আসছিল তাদের মধ্যে একজন ফিরে গেল। বাকি তু'জন এগিয়ে আসতে লাগল। তখন রবিনসন স্থির করলেন, এই তু'জন মৃত্যু দূতের হাত থেকে লোকটাকে বাঁচাতে হবে। ঝোপের আড়াল থেকে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

প্রাণভয়ে ভীত লোকটি তখন তাঁর কাছে এসে পড়েছে। পিছন থেকে রাক্ষসের মতো একজন হানাদার তার দিকে ধেয়ে আসতেই রবিনসন তাঁর হাতের বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সজোরে লোকটার মাথায় আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অজ্ঞান হোয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

দ্বিতীয় রাক্ষসটা দূর থেকে তাঁকে তীর মারবার উদ্যোগ করছে দেখে রবিনসন বন্দুক তুলে তাকে গুলী করলেন।

এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনে সেই বন্দী লোকটি আরও ভয় পেল এবং রবিনসনের পাশ কাটিয়ে ছুটতে লাগল।

রবিনসন প্রাণপণে ছুটে অতি কষ্টে তাকে ধরলেন এবং নানা ইসারা ইঙ্গিতের দ্বারা তার ভয় দূর করলেন। লোকটা তখন বারবার তাকে নমস্কার করতে লাগল এবং তাঁর পায়ের উপর পড়ে কৃতজ্ঞতা জানালো।

রবিনসন তাকে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। তাকে খেতে দিলেন, তার ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। লোকটা সত্যিই অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। কিছু খেয়ে সে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমে আচ্ছন্ন হল।

এই ঘটনাটা ঘটেছিল শুক্রবার। ইংরাজীতে শুক্রবার হল ফ্রাইডে। তাই রবিনসন তার নাম রাখলেন ফ্রাইডে।

সকাল বেলা ফ্রাইডে ঘুম থেকে উঠেই রবিনসনের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল, দু'হাত জোড করে নিজের ভাষায় সে অনেক কথাই বলল। অবশ্য রবিনসন তার কিছুই বুঝতে পারলেন না, কিন্তু লোকটিকে তাঁর খুব ভাল লাগল, তার মুখে সারল্য এবং বুদ্ধির ছাপ। আচার ব্যবহারে বিনীত আনুগত্যের ভাব।

এতদিন রবিনসন এই প্রকাণ্ড দ্বীপের মধ্যে নিঃসঙ্গ ছিলেন। এখন একজন অনুচর জুটলো। ফ্রাইডেকে তিনি ইংরাজীতে কথাবার্তা বলতে শেখালেন, তাকে দিয়ে নানা কাজ করাতে লাগলেন। ফ্রাইডের মাথা ছিল খুব সাফ, বন্য জগতের মানুষ হলেও তার বুদ্ধি ছিল, বোঝবার ক্ষমতা ছিল, সে চট্‌পট কাজ চালানো কথা বলতে শিখলো এবং নানা কাজকর্মে পটু হয়ে উঠল। তাঁর প্রতি ফ্রাইডের ভক্তি আর আনুগত্যের পরিচয় পেয়ে রবিনসন মুগ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, ফ্রাইডের মত অমন প্রভুভক্ত ভৃত্য বোধহয় আর কেউ কখনো পায়নি।

॥ পাঁচ ।

বছরের পর বছর কেটে গেল। এক নাগাড়ে সাতাশ বছর রবিনসন সেই দ্বীপে বাস করলেন। একদিন সকালে ফ্রাইডে এসে খবর দিল তীরের কাছে সমুদ্রের উপর একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

খবর পেয়ে রবিনসন দূরবীন হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জাহাজ এসেছে শুনে তাঁর আনন্দ হল, কিন্তু সে জাহাজ কাদের আর কেনই বা তারা এই অজানা জায়গায় এসেছে তা আগে জানা দরকার। হঠাৎ তাদের দেখা দিয়ে বিপদে না পড়তে হয় রবিনসন তাই তীরের কাছে না গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

তীরের কাছে এসে জাহাজটা নোঙর ফেললো। তারপর জাহাজ থেকে কয়েকজন লোক নৌকা করে দ্বীপে এসে নামল। রবিনসন দেখলেন, তারা সকলেই শ্বেতাঙ্গ, ইংরেজ। আর তাদের মধ্যে তিনজনের হাত পা বাঁধা, তারা বন্দী।

বন্দী তিনজনকে তীরের কাছে একটা চড়ায় ফেলে বাকি লোকগুলো দ্বীপের মধ্যে ঢুকে গেল আর সেই সুযোগে রবিনসন বন্দী তিনজনের কাছে গিয়ে ব্যাপার কি জানতে চাইলেন।

রবিনসনের চেহারা আর পোষাক দেখে বন্দী তিনজন তো প্রথমটায় ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর রবিনসনের কথায় আর আশ্বাস বাক্যে যখন তারা বুঝলো যে তিনি তাদেরই স্বজাতি তখন তারা তাদের বিপদের কথা জানালো। তাদের মধ্যে একজন ওই জাহাজেরই ক্যাপ্টেন, বাকি দু'জন তার মেট। জাহাজের খালাসীরা ষড়যন্ত্র করে তাদের বন্দী করেছে, তাদের মতলব বন্দীদের এখানে ফেলে রেখে তারা জাহাজ নিয়ে পালাবে।

রবিনসন তখন তাদের বাঁধন খুলে দিলেন, তারপর তাদের হাতে লাঠি সোঁটা পিস্তল দিয়ে ফ্রাইডেকে সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে বিদ্রোহী-দের দমন করবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন।

বিদ্রোহী খালাসীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তারা এভাবে আক্রান্ত হবে। তারা লড়াই করবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু রবিনসনের বন্দুকের গুলীতে যখন দলের চাঁই দুজন মারা পড়ল এবং আরও তিন-চারজন জখম হল তখন তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করল। রবিনসন সদলবলে এগিয়ে গিয়ে তাদের ধরে বেঁধে ফেললেন। যে দু'জন মারা পড়েছিল, সকলে মিলে মাটি খুঁড়ে তাদের কবর দিলেন, আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

রবিনসনের জন্যে জাহাজের কাপ্তেন আর মেট দু'জন শুধু যে প্রাণে বেঁচে গেল তাই নয়, জাহাজটাও তারা ফিবে পেল।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে কাপ্তেন রবিনসনকে দেশে ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। রবিনসন তো এতদিন সেই সুযোগই খুঁজছিলেন। এমন জায়গায় তিনি এসে পড়েছিলেন সে জায়গাটা যেন জগৎ ছাড়া। এখানকার সমুদ্র দিয়ে এতদিনের মধ্যে একটাও জাহাজ আনাগোনা করেনি। আজ যখন ভাগ্যক্রমে সুযোগ এসেছে তখন সে সুযোগে তিনি ছাড়বেন কেন? তিনি ফ্রাইডেকে নিয়ে জাহাজে উঠলেন।

অনুকূল বাতাসে জাহাজ ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করল।

সুদীর্ঘ আটাশ বছর পরে অসমসাহসী অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ী অ্যাডভেঞ্চার নায়ক রবিনসন ক্রুশো সেই অজ্ঞাত দ্বীপের বাস শেষ করে আবার দেশের মাটিতে এসে পা রাখলেন।

দি ডেকামেরন : বোকাসিও

ইতালীর কথাসাহিত্য জগতের আদিপুরুষ ছিলেন জিওভানি বোকাসিও। জন্ম ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের কাছে এক গ্রামে। তাঁর রচিত 'দি ডেকামেরন' (দশ রাতের উৎসব) একটি গল্প চক্র, অর্থাৎ বহুজনের বহু গল্প ছড়িয়ে আছে এর মধ্যে। গ্রন্থটিতে এমন অনেক কাহিনী আছে যা চূড়ান্ত আদিরসাত্মক, আবার এমন কয়েকটি কাহিনী আছে যারা মনুষ্যত্বের মহিমায় শাশ্বতকালের রসলোকে উত্তীর্ণ। তেমনি একটি কাহিনী এখানে পরিবেশিত হল।

। এক ।

অত্যন্ত খামখেয়ালী এক জমিদার। মার্কুইস অফ সালুজ্জো। একদিকে যেমন দরাজ মন, স্ফূর্তিবাজ, শিকারের প্রচণ্ড নেশা, প্রজাবৎসল, অন্যদিকে তেমনি জেদী আর কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

অনুগত রাজভক্ত প্রজারা তাঁকে খুবই ভালবাসে। কিন্তু প্রজাদের মনে সুখ নেই।

কেন? প্রজাদের তো কোন অভাব রাখিনি আমি! তবে তারা সুখী নয় কেন?

এক অমাত্যের মুখে প্রজাদের মনে সুখ নেই শুনে মার্কুইস তাকে এই প্রশ্ন করলেন।

অমাত্য সবিনয়ে বললে, প্রভু, প্রজারা বলছে, আপনি এখনো বিবাহ করলেন না। আপনার বয়স হোয়ে যাচ্ছে। এর পর আর আপনার বিবাহ করবার ইচ্ছে একেবারেই থাকবে না।

অমাত্যের কথা শুনে মার্কুইস্ দরাজ গলায় হেসে উঠলেন,

এই কথা! তা, নাই বা হল বিয়ে! তাতে প্রজাদের কিসের অত দুঃখ?

অমাত্য বললে, দুঃখ হবে না হুজুর। এত বড় ঐতিহ্যসম্পন্ন জমিদার বংশ, শেষ পর্যন্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে লোপ পাবে। এই চিন্তায় প্রজারা খুবই বিমর্ষ।

বেশ সময় কাটছিল, শিকারে, খেলা-ধূলায়, আমোদ-প্রমোদে! বিবাহ! উত্তরাধিকারী। বংশ রক্ষা! প্রজারা সহসা মার্কুইসের মনে এক নতুন ভাবনা ঢুকিয়ে দিল! শুধু তাই নয়, তারপর থেকে প্রজাদের অনুরোধ উপরোধ পীড়াপীড়ি সুরু হল।

এ তো এক আচ্ছা উড়ো ঝঞ্ঝাট এসে পড়ল তাঁর জীবনে, মার্কুইস মহা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। বিয়ে করবার কোন পরিকল্পনা তো এতদিন ছিল না! আচ্ছা, বেশ, এখন যদি বিয়ে করতেই হয়, পাত্রী কই?

পাত্রীর অভাব কি প্রভু? হুকুম করলে হাজার পাত্রী এনে হাজির করতে পারি।

না, না, হাজার হাজারে দরকার নেই। সে তো আরও বিপদ! একটা হলেই হবে। দেখা যাক, নিজেই যদি খুঁজে পেতে নিতে পারি!

এক দিন শিকারে বেরিয়েছেন মার্কুইস!

একটা মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একটি মেয়েকে। চাষীর মেয়ে! কিন্তু ভারী সুশ্রী দেখতে। আর সেদিনকার সেই সকালের সোনালী আলোয় সেই চাষীর মেয়ের রূপলাবণ্য যেন মার্কুইসের মনে এক নতুন স্পন্দন জাগালো।

ঘোড়া থামালেন তিনি।

মেয়েটি কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছিল! সে দু'চোখ মেলে অবাক হয়ে মার্কুইসের দিকে তাকালো! ঘোড়ার পিঠে যেন রূপকথার রাজপুত্র চলেছেন মৃগয়ায়।

মাকু ইস ঘোড়া থেকে নামলেন। কাছে ডাকলেন মেয়েটিকে হাতের ইসারায়।

মেয়েটি এসে দাঁড়ালো তাঁরে সামনে!

তোমার নাম কি কন্যে?

মেয়েটি অস্ফুটে বললে, গ্রিজেল্‌ডা!

সুন্দর নাম! গ্রিজেল্‌ডা! আচ্ছা, গ্রিজেল্‌ডা, তোমায় একটি কথা বলব। রাগ করবে না তো?

মেয়েটি বিস্মিত!

কি কথা?

তুমি আমায় বিয়ে করবে?

মাকু ইসের কথা শুনে গ্রিজেল্‌ডা হকচকিয়ে গেল।

কি! কথা বলছ না যে! দেখ, আমি দেখতে মন্দ নই। বয়সও বেশি নয়। আর আমার পয়সাকড়ি আছে। তোমার কষ্ট হবে না। কি বল, রাজী?

গ্রিজেল্‌ডা কথা না বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

কিন্তু, একটি সর্ত আছে গ্রিজেলডা?

কি সর্ত?

সর্ত এই যে, যদি আমায় বিয়ে কর তাহলে আমি যখন যা বলব তোমায় বিনা প্রতিবাদে বিনা দ্বিধায় আমায় খুসী করবার জন্যে তাই করতে হবে, আমার কথা শুনতে হবে। দেখ, বেশ করে ভেবে নাও। পারবে কি না?

নম্রকণ্ঠে গ্রিজেল্‌ডা বললে পারবো।

ব্যস! বিয়ে হোয়ে গেল। ধুমধাম, আলো, আতসবাজী, সমারোহ। প্রজাদের আনন্দ আর ধরে না। জমিদার তাঁর রাজকোষ খুলে দিয়েছেন। যে যত পারো নিয়ে যাও। সাতদিন ধরে অহোরাত্র আনন্দে মেতে থাকো।

॥ দুই ॥

বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই গ্রিজেল্ডা নিজের গুণে সবাইকে বশ করল। প্রজারা তার নামে অজ্ঞান, আত্মীয়-কুটুম্বরা মোহিত, জমিদার স্বয়ং পরম চরিতার্থতায় বিগলিতচিত্ত।

দিন কাটছিল সুখে, অনাবিল আনন্দে। কিন্তু খেয়ালী জমিদারের বুঝি টনক নড়ল। তাঁর মাথায় খেয়াল চাপল, গ্রিজেল্ডাকে যেকথা তিনি বলেছিলেন, তার পরীক্ষা তো করা হয়নি। অতএব গ্রিজেল্ডাকে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হোতে হল :

*　　　*　　　*

একটি মেয়ে হয়েছে গ্রিজেল্ডার।

জমিদারির চারিদিকে উৎসব ; প্রজারা মোচ্ছব লাগিয়েছে। রাজ্যময় আনন্দের স্রোত বইছে। এমন সময় একদিন মার্কুইস এসে স্ত্রীকে বললেন, দেখ গ্রিজেলডা, একে তো তুমি চাষার ঘরের মেয়ে, সেজন্যে প্রজারা সব ছিছিক্কার করছে, তার ওপর প্রথম সন্তান প্রসব করলে, মেয়ে। আমার তো মুখ দেখানো ভার হোয়ে উঠেছে।

মাথা হেঁট করে গ্রিজেল্ডা বললে, প্রভু, আমি অতি দীন। যে মর্যাদা আপনি আমায় দিয়েছেন, আমি জানি আমি তার যোগ্য নই। এখন আপনার মান যাতে রক্ষা হয় সেজন্যে আপনি যা করবার করুন, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।

মার্কুইস আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরে এলো এক ভৃত্য। সে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

তুমি কাঁদছ কেন ? বল, কি তোমার দুঃখ। আমার সাধ্য থাকলে আমি নিশ্চয় তোমার দুঃখ দূর করব।

গ্রিজেল্ডার কথায় ভৃত্যটি আরও আকুল হল। শেষকালে বললে,

মা, কর্তার আদেশ না মানলে গর্দান যাবে, তাই বাধ্য হয়ে আমায় আসতে হয়েছে।

কেন এসেছো বল !

আমি এসেছি আপনার মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যে।

গ্রিজেল্‌ডা এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললে, বুঝেছি। তারপর মেয়েটিকে শেষ একটি চুমু খেয়ে ভৃত্যের হাতে তুলে দিল।

সে মনে করেছিল. বাচ্চাটিকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হবে। কিন্তু তবুও সে একটিও কথা বললে না, এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না। স্বামীর ইচ্ছাই তার কাছে সব.

মার্কুইস কন্যাটিকে অন্য এক শহরে তাঁর ভগ্নীর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা গ্রিজেল্‌ডাকে জানালেন না।

আরও কিছুদিন পরে গ্রিজেল্‌ডা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল।

প্রজারা আবার আনন্দে মেতে উঠল। এবার আনন্দ শত গুণ বেশী। জমিদারের উত্তরাধিকারী জন্মালো। মার্কুইসও খুব খুশী।

মার্কুইস গ্রিজেল্‌ডার কাছে গেলেন মুখ কালো করে, বললেন, দেখ, আমি তার প্রজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। তারা সব টিটকারী দিচ্ছে। বলছে, চাষার নাতি হবে আমাদের জমিদার, এ আমাদের সহ্য হবে না।

গ্রিজেল্‌ডা নীরবে স্বামীর কথা শুনছিল। অস্ফুটে বললে, কি করবেন তাহলে ?

বাধ্য হোয়ে, মেয়েটার বেলায় যে ব্যবস্থা করেছি, এবারও তাই করতে হবে।

করুণ মৃদু হাসল গ্রিজেল্‌ডা, বললে, আপনার মন যাতে ভাল থাকে, আপনার মান যাতে বজায় থাকে তা আপনি নিশ্চয়ই করবেন। আমার জন্যে মোটেই ভাববেন না। আপনার সুখের কাছে আমার দুঃখ একেবারেই তুচ্ছ বলে আমি মনে করি।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন খেয়ালী জমিদার। তার পর চলে গেলেন।

পরের দিন কচি শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এলো এক ভৃত্য মাকু´ইস আগের মত ছেলেটিকেও পাঠিয়ে দিলেন পিসির কাছে।

সবাই মনে করল, মতিচ্ছন্ন জমিদার তার ছেলে মেয়ে দুটিকেই মেরে ফেলেছেন। প্রজারা হায় হায় করতে লাগল। কি কুক্ষণেই তারা তাদের রাজাকে বিয়ে করতে বলেছিল! গ্রিজেল্‌ডার মতো রমণী পৃথিবীতে কি আর হয়? এমন স্ত্রীকে এই অনাদর, তার প্রতি এত নিষ্ঠুরতা। প্রজারা অনেকে প্রকাশ্যেই জমিদারকে গাল দিতে লাগল।

কিন্তু গ্রিজেল্‌ডার মুখে এতটুকু বিরাগের চিহ্ন নেই। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে এলে বলত, না, না, আমার কোন দুঃখ নেই। স্বামী যে ব্যবস্থায় মনে শান্তি পেয়েছে সে ব্যবস্থায় তার কিছু বলবার নেই, বরং স্বামী যে সুখী বোধ করেছেন তাতে সেও সুখী মনে করছে নিজেকে।

॥ তিন ॥

মাকু´ইসের কিন্তু এততেও আশ মিটল না। শেষ পরীক্ষা করলেন তিনি! চরম আঘাত হানলেন, পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর বুকে। কিছুদিন পরে একদিন গ্রিজেল্‌ডার মহলে গিয়ে বললেন, দেখ, অনেক ভেবে-চিন্তে আমি স্থির করলাম যে আমার আবার বিয়ে করা উচিত। এবং তার আগে তোমায় ত্যাগ করা দরকার।

দুচোখ তুলে গ্রিজেল্‌ডা বললে, বেশ তো, সেই মতো ব্যবস্থা করুন। আপনাকে তো বলেছি, আপনার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা!

মাকু ইস বললেন, হ্যাঁ, আমি আবার বিয়ে করব এবং আমার যোগ্য ঘর থেকে মেয়ে আনবো, রূপে বল বংশ মর্যাদায় বল, সে সব সেরা হবে। তাহলে আর কেউ কোন বিরূপ কথা বলতে পারবে না।

সে তো বেশ ভালই হবে।

হ্যাঁ। তুমি কালই তোমার বাপের বাড়ী চলে যেও।

এবার বুঝি গ্রিজেল ডার চোখে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি হাসি দিয়ে কান্না চেপে বললে, তাই - যাব!

পরের দিন চলে গেল গ্রিজেল্ডা! সঙ্গে নিল না একটিও গয়না নিল না কোন ভাল পোষাক! মোটা চটের মতো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে সে বাপের কুটিরে ফিরে গেল!

দিন যায়! গ্রিজেল্ডা নিত্য নতুন খবর পায়। কখনো শোনে, রাজবাড়ী রং করা হচ্ছে, কেউ এসে খবর দেয়, এবার যার সঙ্গে জমিদারের বিয়ে হচ্ছে, তার বাপও মা জমিদার। কেউ জানায়, এবার যে বউ হয়ে আসছে, সে তো মেয়ে নয়, যেন ডানাকাটা পরি!

দিন যায়। বছর যায়। গ্রিজেলডার কাছে নানা খবর আসে। একদিন এলো জমিদারের পেয়াদা, সঙ্গে লোক লস্কর, গাড়ি।

কি ব্যাপার?

প্রভু ডেকেছেন গ্রিজেলডাকে।

বেশ তো! তাঁর আদেশ যখন, তখন যাব বৈকি!

গ্রিজেল্ডা এলো স্বামীর কাছে।

মাকু ইস বললেন, দেখ, শিগগিরই আমার নতুন স্ত্রীকে ঘরে আনবো। তখন একটা উৎসব করতে হবে তো?

তা হবে বৈকি!

হ্যাঁ তাইতো বলছি। তুমি এত দিন এ বাড়ির গিন্নি ছিলে! কোথায় কি আছে তুমি সবই জানো! তাই তোমার পক্ষেই উৎসবের আয়োজন করা সহজ হবে। তাছাড়া কাদের নেমন্তন্ন করা দরকার তাও তুমি জানো। এ সবের ভার তোমাকেই নিতে হবে! বিয়ের

হাঙ্গামা চুকে গেলে, নতুন বৌকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে তুমি আবার বাপের বাড়ী চলে যেও।

ক্ষণেকের জন্যে গ্রিজেলডার বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল। বুকের ভিতরটা যেন ফেটে চৌচির হোয়ে যাচ্ছে! কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

কাজে লেগে গেল গ্রিজেলডা। ঘর দুয়ার সাজালো, ঘসে মেজে চারিদিক ঝকঝকে করে তুললো। নিজের হাতে ঘরের মেঝে মুছলো, দেওয়াল পরিষ্কার করল। তার পরণে কিন্তু সেই মোটা কাপড় সেই নিরাভরণ দেহ।

বাড়ির বড় বড় কর্মচারীরা তার দুঃখে আড়ালে কাঁদলো। প্রজারা কাতর হল তার অবস্থা দেখে। কিন্তু গ্রিজেলডার মুখে সেই মধুর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি লেগেই আছে।

বিয়ের দিন এলো। প্রথা অনুযায়ী বধূ আসবে স্বামীগৃহে। সেখানে সম্পন্ন হবে বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান। তারপর, মধুযামিনী, ফুলশয্যা!

গ্রিজেলডা বধূর আগমন অপেক্ষা করছে। বুকের মধ্যে তার যে কী হাহাকার উঠেছে, মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

মার্কুইস এলেন। সঙ্গে একটি পনেরো ষোলো বছরের পরমাসুন্দরী মেয়ে।

গ্রিজেলডা তাকে অভ্যর্থনা করল।

সবাই নববধূর রূপে মুগ্ধ! কী তার চমৎকার নম্র কথাবার্তা। কী সুন্দর ব্যবহার? বোঝা গেল, শিক্ষিতা মেয়ে।

এক সময় মার্কুইস গ্রিজেলডাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কেমন দেখলে মেয়েটিকে?

গ্রিজেলডা বললে চৎমকার। খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নিশ্চয়। আমার মত দুঃখীর মেয়ে নয়! তাহলে আমি এবার যাই!

এখনি যাবে?

হ্যাঁ। সব কাজ শেষ হয়েছে। আর তো আমার কিছু করবার নেই। যাবার আগে একটি প্রার্থনা জানাই প্রভু!

উৎসুক চিত্তে মার্কুইস বললেন, বল, বল কি প্রার্থনা!

প্রার্থনা এই, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন এর সঙ্গে তা করবেন না। এ মেয়েটি তা সইতে পারবে না। আমি গরীব, দুঃখ কষ্টে মানুষ, তাই, আমি যা সইতে পারলাম, এ-মেয়ে তা পারবে না।

আর স্থির থাকতে পারলেন না মার্কুইস। অভিনয় শেষ হল। ব্যাকুল হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রিজেল্ডাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলেন, গ্রিজেল্ডা, প্রিয়তমে, আমার ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে এত দিন ছলনা করেছি। তুমি বিজয়িনী! আমি হেরে গেছি তোমার কাছে।

বিহ্বল কণ্ঠে গ্রিজেল্ডা বললে, কি বলছেন প্রভু! আমি তো কিছু বুঝতে পরছি না।

শোন বলি! আমার ধারণা ছিল, দুঃখে কষ্টে পড়লে, মেয়েদের স্বামীভক্তি বল, সহিষ্ণুতা বল কিছুই আর থাকে না তাই তোমায় পরীক্ষা করে দেখছিলাম!

পরীক্ষা করছিলেন! এত দিন ধরে?

হ্যাঁ গো! তাই তো করছিলাম এই দীর্ঘ ষোল বছর ধরে। যে মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছে সে কে জানো? সে আমাদেরই মেয়ে। আর তোমায় কোথাও যেতে হবে না। এ সংসার তোমার! এ রাজ্য তোমার। আমি তোমার অনুগত স্বামী। যে শিক্ষা তুমি আমায় দিয়েছো তা আমার মর্মে চিরকাল গাঁথা থাকবে। তুমি মহিয়সী! তুমি অনন্যা।

ছেলেমেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। গ্রিজেল্ডা দু'জনকে বুকে চেপে ধরল। তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দুঃসহ আবেগে কাঁপতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

আর, তারপর চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখর হোয়ে উঠল। উৎসব চলল সারা রাত ধরে।

হ্যামলেট : শেক্সপীয়ার

ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা রাত্রে পাহাড়া দিতে গিয়ে সম্প্রতি দেখেছে, প্রাসাদের পাঁচীলে এক ছায়ামূর্ত্তি মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়। কি যেন সে বলতে চায়। বলতে পারে না। প্রহরীদের মনে হয়েছে, প্রেতমূর্ত্তির চেহারা যেন অবিকল সদ্যমৃত রাজার মত। 'প্রহরীর' তাদের উপরওয়ালা হোরেশিওকে সে কথা জানাল। হোরেশিও ছিলেন মৃত রাজার পুত্র হ্যামলেটের অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

হোরেশিও একদিন রাত্রে প্রহরীদের সঙ্গে থেকে সেই প্রেতমূর্তি দেখলেন এবং সে কথা পরদিন হ্যামলেটকে জানালেন।

হ্যামলেট পিতৃশোকে কাতর। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি রাজধানীতে ছিলেন না। ফিরে এসে তিনি তাঁর মা ও কাকার কাছে শোনেন যে বৃদ্ধ রাজা একদিন বাগানে বসেছিলেন সেই সময় এক বিষাক্ত সাপের কামড়ে তিনি প্রাণ হারান। পিতার এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেলেন হ্যামলেট, তার চেয়েও ব্যথিত হলেন যখন দেখলেন যে পিতার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই তাঁর মা তাঁর কাকা ক্লডিয়াসকে বিবাহ করলেন এবং ক্লডিয়াস সিংহাসন অধিকার করে বসলেন।

হোরেশিওর মুখে প্রেতের কথা শুনে হ্যামলেট রাত্রিবেলা প্রাসাদের পাঁচীলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর ঠিক শেষ প্রহরে সেই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হল। হ্যামলেট বলে উঠলেন-- এ যে আমার বাবা!

প্রেতমূর্ত্তি হাতছানি দিয়ে হ্যামলেটকে ডাকল। হ্যামলেট এগিয়ে গেলেন। নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রেতমূর্ত্তি থামল। হ্যামলেট বললেন —কে তুমি? কথা বল।

চাপা গলায় প্রেতমূর্তি বলে উঠল—হ্যামলেট, সত্যিই আমি তোমার পিতা, তোমার নিহত পিতা।

—নিহত? মানে আপনাকে খুন করা হয়েছে?

—হ্যাঁ! তোমার কাকা ওই পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছে। তোমার মা পাপীয়সী সেই স্ত্রীলোকটা তাকে সাহায্য করেছে। তুমি এর প্রতিশোধ নাও পুত্র। সেই কথাই বলবার জন্যে আমি বারবার আসছি। আজ বলা হল। আমি চললাম।

সেদিন থেকে তরুণ হ্যামলেটের মনে সেই রাত্রির ঘটনা অহরহ জেগে রইল। কিন্তু এক ছায়ামূর্ত্তির কথাই কি তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট? কোন বাস্তব প্রমাণ কি পাওয়া যায় না? ভাবতে ভাবতে হ্যামলেট যেন পাগল হয়ে গেলেন।

রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী পলোনিয়াসের এক কন্যা ছিল। তার নাম ওফেলিয়া। হ্যামলেট আর ওফেলিয়া দু'জনে দু'জনকে ভালবাসতেন। তাঁদের বিবাহ এক রকম স্থির হয়েই ছিল। কিন্তু হ্যামলেটের হঠাৎ পরিবর্তন এবং তাঁর পাগলের মতো হাবভাব দেখে পলোনিয়াস কিং-কর্তব্য বিমূঢ় হলেন। যে মানুষ বাপের শোকে পাগলের হয়ে গেছে তাকে বিয়ে করে তাঁর মেয়ে কি সুখী হবে?

হ্যামলেট ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন তাঁকে ঘিরে একটা চক্রান্ত চলেছে যে চক্রান্ত তাঁর পিতার মৃত্যুতেই শেষ হয় নি। কারা এই চক্রান্তের ভিতর আছে জানা দরকার। রাজা, রাণী, পলোনিয়াস, ওফেলিয়া প্রত্যেককে আড়াল থেকে লক্ষ্য করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে হ্যামলেট ক্রমশ ভান করতে লাগলেন যেন তিনি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছেন, তাঁর সেই পাগলের মত কথাবার্তা আর আচরণে সকলেই বিমূঢ় হল। সবচেয়ে বিব্রত হলে, সরলপ্রাণা ওফেলিয়া। বেদনায় তিনি ভেঙে পড়লেন।

এই সময় রাজা ও রাণীর মনের ভাব অনুধাবন করবার জন্যে

হ্যামলেট এক কৌশল করলেন। রাজা ও রাণীকে আনন্দ দেবার জন্যে মাঝে মাঝে রাজবাড়ীতে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা হত। সেই সময় একটা নাটুকে দল এসেছিল রাজধানীতে। হ্যামলেট সেই দলের সঙ্গে গোপনে বন্দোবস্ত করলেন যে রাজবাড়ীতে অভিনয়ের জন্যে এবার নিজে একটি নাটক লিখে দেবেন, এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিখিয়ে দেবেন। দলের কর্তা আর শিল্পীরা খুবই খুসী হল এ প্রস্তাবে। যুবরাজ নাটক লিখে দেবেন, অভিনয় শেখাবেন—এ তো তাদের পক্ষে মস্ত সৌভাগ্যর কথা।

কথামত নাটক লিখেলেন হ্যামলেট। গল্পটা হল ঠিক সেই রকম যে রকম কাহিনী প্রেতমূর্তি হ্যামলেটকে বলেছিল। অর্থাৎ রাজার ভাই আর স্ত্রীর ষড়যন্ত্র, বাগানের ভিতর ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা এই সব ঘটনা।

অভিনয়ের দিন হ্যামলেট অদূর বসে রাজা ও রাণীর মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন। নাটক যতই এগিয়ে চলল ক্লডিয়াসের মুখ ততই বিবর্ণ হতে লাগল। আসনে বসে তিনি চঞ্চল হতে লাগলেন, অবশেষে বিষ দেওয়ার দৃশ্যে আর স্থির থাকতে পারলেন না, উঠে চলে গেলেন। হ্যামলেট একদৃষ্টে ক্লডিয়াস আর তাঁর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। আর তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই, প্রেত যা বলেছে তা সত্য। তাহলে তাঁর কর্তব্যও এখন স্পষ্ট। প্রেতের কাছে শপথ করেছেন, ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে আর প্রতিবিধান তিনি করবেন। অতএব, এ পাপ যে করেছে তাকে হ্যামলেট চরম শাস্তি দেবেন নিজের হাতে। এই হল তাঁর পণ।

এদিকে রাণী, ক্লডিয়াস আর পলোনিয়াস পরামর্শ করলেন। হ্যামলেটকে আর এখানে রাখা নিরাপদ নয়। তাকে কৌশলে দেশের বাইরে পাঠাতে হবে। ঠিক হল, হ্যামলেটের বিদেশ যাওয়ার কথা রাণীই জানাবেন তাঁকে। পলোনিয়াস রাণীর সঙ্গে হ্যামলেটের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন। পাছে হ্যামলেট পাগলের খেয়ালে কিছু

করে বসেন সেই ভয়ে দরকার হলে তাঁকে বাধা দেবার জন্য পলোনিয়াস সেই ঘরের ভিতর একটা পরদার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

রাণীর সঙ্গে কথায় কথায় হ্যামলেট উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। রাণী রেগে বললেন, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ তা কি ভুলে গেছ!

হ্যামলেট বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছি! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, তুমি আমার মা! কিন্তু তুমি কি তোমার কুকর্মের কথা শুনতে চাও আমার মুখে?

হ্যামলেটের উন্মাদের মতো চাউনি আর হাবভাব দেখে রাণী ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, তুই আমাকে হত্যা করতে চাস নাকি?

তাই শুনে তলোয়ারের উপর হাত রেখে হ্যামলেট উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। আরও ভয় পেয়ে রাণী আর্তস্বরে বলেন, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

সঙ্গে সঙ্গে পরদার আড়াল থেকে পলোনিয়াস বলে উঠলেন, ভয় নেই!

হঠাৎ সেই শব্দ শুনে আর পরদা নড়তে দেখে হ্যামলেটের মনে হল, ঐ পরদার আড়ালে নিশ্চয় পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস লুকিয়ে আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তলোয়ার খুলে পরদা ভেদ করে সেই তলোয়ার বসিয়ে দিলেন, আর সেই আঘাত গিয়ে পড়ল পলোনিয়াসের বুকে। তিনি রক্তাক্ত দেহে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

* * *

হ্যামলেট পলোনিয়াসকে হত্যা করে বিনম ব্যথিত হলেন। পলোনিয়াস ছিলেন তাঁর প্রেমাস্পদা ওফেলিয়ার বাবা। পিতার মৃত্যুতে ওফেলিয়া শোকে ভেঙে পড়লেন। যে হ্যামলেটকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন সেই হ্যামলেট তাঁর বাবাকে মেরে ফেললেন! পিতার শোকে ওফেলিয়া ক্রমে পাগলিনী হয়ে গেলেন।

হ্যামলেট দেখলেন, ক্লডিয়াসের পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে যাওয়া ছাড়া তাঁর গতি নেই। তিনি রাজী হলেন। ক্লডিয়াস

নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর যাত্রার সমস্ত আয়োজন করে দিলেন। কয়েকজন অনুচর তাঁর সঙ্গে দেওয়া হল। তারা ক্লডিয়াসের নিয়োজিত লোক। সুবিধা পেলেই তারা হ্যামলেটকে মেরে ফেলবে। এইরকম নির্দেশ গোপনে তাদের দেওয়া হল।

হ্যামলেট চলে যাবার পর পলোনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস দেশে ফিরে এলেন। কিছুদিন আগে তিনি রাজ্যের কাজে ফরাসী দেশে গিয়েছিলেন। লিয়ার্টিস হ্যামলেটের সমবয়সী। দু'জনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল: দু'জনেই ছিলেন দক্ষ অসিযুদ্ধ বিশারদ। বাড়ী ফিরে লিয়ার্টিস যখন শুনলেন যে হ্যামলেট তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন এবং সেই শোকে তাঁর ভগ্নী পাগল হয়ে গিয়েছেন তখন তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল হ্যামলেটের উপর। আর তাতে উসকানি দিলেন দুরাত্মা ক্লডিয়াস। লিয়ার্টিসকে উত্তেজিত করে বললেন, যদি তুমি সত্যিই পিতৃভক্ত হও, তাহলে তোমার উচিৎ পিতৃঘাতককে হত্যা করা। কিন্তু হঠাৎ রাগের মাথায় কিছু করো না। তার ফল ভাল হবে না। এখন চুপচাপ থাকো। আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

কয়েকদিন পরেই খবর পাওয়া গেল হ্যামলেট ফিরে আসছেন। ক্লডিয়াস তখন তাঁকে বধ করবার জন্য এক নতুন ফন্দী আঁটলেন। তিনি এক তলোয়ার খেলার উৎসবের আয়োজন করলেন। ডেনমার্কের তরুণ মহলে হ্যামলেট আর লিয়ার্টিস দুজনেরই ভাল অসিযুদ্ধবিদ বলে খ্যাতি ছিল। যেন নিছক খেলার আনন্দের জন্য ক্লডিয়াস হ্যামলেট আর লিয়ার্টিসের মধ্যে এই খেলার আয়োজন করলেন। এরকম প্রতিযোগিতায় এক ধরণের কম-ধারালো তলোয়ার নিয়ে খেলা হয়। কিন্তু ক্লডিয়াস লিয়ার্টিসের তরবারিতে একরকম অতি মারাত্মক বিষ মাখিয়ে রেখে দিলেন। সেই বিষের সামান্য একটু রক্তে মিশলেই মৃত্যু অনিবার্য। যদি তাতেও কাজ না হয়, অর্থাৎ হ্যামলেট যদি অসির আঘাত না পায় সেই আশংকায় ক্লডিয়াস আর এক বিষের ফাঁদ তৈরী

করে রাখলেন। যুদ্ধের সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে হ্যামলেট যখন জল চাইবেন তখন তাঁকে বিষ মেশানো সরবৎ দেওয়া হবে। হ্যামলেটের জন্যই একটা পৃথক পাত্রে সেই সরবৎ তৈরী রাখা হবে।

যদিও পিতাকে হত্যা করার জন্য লিয়ার্টিস হ্যামলেটের উপর দারুণ রেগে ছিলেন, তাহলেও এইভাবে শঠতার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে বধ করতে তাঁর বিবেকে বাধছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় তাঁর ভগ্নী ওফেলিয়ার শোচনীয় মৃত্যু তাঁর বিবেককে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিল।

পাগল হয়েও ওফেলিয়া হ্যামলেটকে ভুলতে পারে নি। একদিন তাঁর বিয়ে হবে হ্যামলেটের সঙ্গে। অমনি তিনি নববধূর সাজে নিজেকে সাজালেন. এবং সেই বেশেই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে পা ফসকে নদীর জলে পড়ে ডুবে গেলেন। যখন তাঁর মৃতদেহ ভেসে উঠল তখন সবাই অবাক হয়ে দেখল. মৃতদেহের মধ্যে মৃত্যুর যেন কোন চিহ্ন কোন বেদনা নেই। নববধূর মতো ফুলের মালায় সজ্জিত অপরূপ সুন্দরী তরুণী যেন নদীর জলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

রাজধানীতে প্রবেশ করার আগেই হ্যামলেট ওফেলিয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেলেন। শুনে তাঁর মন কাতর হল। তিনি ভেঙে পড়লেন। ওফেলিয়াকে তিনি সত্যিই গভীর ভাবে ভালবাসতেন।

হ্যামলেট গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করে বন্ধু হোরেশিওকে সঙ্গে নিয়ে সোজা কবর ভূমিতে উপস্থিত হলেন এবং অন্তরালে দাঁড়িয়ে ওফেলিয়াকে সমাধিস্থ করা দেখলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। সমাধির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে লিয়ার্টিস হঠাৎ রাগে জ্ঞান হারিয়ে তলোয়ার খুলে হ্যামলেটকে মারতে তেড়ে গেলেন। তাই দেখে চতুর ক্লডিয়াস তাড়াতাড়ি লিয়ার্টিসকে এক পাশে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বললেন, করছ কি ? এখানে নয়। আমি যে ফন্দী করেছি সে কথা মনে করে এখন স্থির হও।

হ্যামলেট মনে মনে লিয়ার্টিসকে ভালবাসতেন। তাই তিনি উপযাচক হয়ে লিয়ার্টিসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা

করলেন। সময় বুঝে ক্লডিয়াস লিয়ার্টিসের কানে মন্ত্রণা দিলেন এবং লিয়ার্টিস হ্যামলেটকে পুরনো বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ অসিযুদ্ধে আমন্ত্রণ জানালেন। বন্ধুর আহ্বান পেয়ে হ্যামলেট সে আমন্ত্রন সাদরে গ্রহণ করলেন।

ক্লডিয়াস খুবই আনন্দিত। বিরাট সমারোহে তলোয়ার খেলার আসর বসানো হল। নির্দিষ্ট দিনে তিনি রাণী এবং বিশিষ্ট লোকদেব নিয়ে সেই খেলা দেখতে এলেন।

হ্যামলেট জানলেন না, লিয়ার্টিসের বন্ধুত্বের আড়ালে কি নিদারুণ প্রতিহিংসার শিখা জ্বলছে রাজা যেরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী লিয়ার্টিস দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে ভোঁতা তলোয়ারের পরিবর্তে একটা শানিত তরবারি ঠিক করে রাখলেন এবং তার সর্বাঙ্গে লাগিয়ে রাখলেন মারাত্মক বিষ। সেই অসি নিয়ে তিনি খেলায় নামবেন।

খেলার উৎসব আরম্ভ হবার আগে ক্লডিয়াস আনন্দে গদগদ চিত্তে সবাইকে জানালেন যে আজ এই দুই পুরনো বন্ধু তাদেব মনের সব ভুল বোঝাবুঝি ভুলে বন্ধুভাবে খেলায় নেমেছে এতে তিনি ও রাণী পরম আনন্দিত।

নিমন্ত্রিতেরা সাধুবাদ দিলেন। বাজনা বেজে উঠল। হ্যামলেট ও লিয়ার্টিস খেলার বেশ পরিধান করে আসরে নামলেন। ওফেলিয়ার মৃত্যুতে হ্যামলেটের প্রাণ হাহাকার করছিল। তারই মধ্যে তাঁর প্রেমাস্পদার ভাইকে আবার বন্ধুরূপে পেয়ে তাঁর মন আর্দ্র হল। খেলা আরম্ভ হবার আগে লিয়ার্টিসের দু'হাত ধরে গভীর আবেগে হ্যামলেট বললেন, বন্ধু, ভুলে যাও উন্মাদ হ্যামলেটের ত্রুটি। আমাকে ক্ষমা করো।

হ্যামলেটের কথার উত্তরে লিয়ার্টিস সকলকে শুনিয়ে বললেন, বন্ধু তোমার কথা শুনে আমার মনে আর কোন ক্ষোভ নেই। আজ থেকে তুমি আর আমি সেই দুই আগেকার বন্ধু

সবাই উচ্চস্বরে আনন্দ প্রকাশ করল। ক্লডিয়াসও সেই আনন্দে যোগ দিয়ে সুরা পরিবেশককে ডেকে বললেন, সুরার পাত্রগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো! আমি নিজে আজ এই আনন্দ উৎসবে সকলের পাত্র ভরে দেব।

আবার বাজনা বেজে উঠল। হ্যামলেট ও লিয়ার্টিস দুজনে এগিয়ে গিয়ে যার যার তলোয়ার তুলে নিলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিরা খেলার আগে পরস্পরের তলোয়ার পরীক্ষা করে দেখে নেয়। কিন্তু আজ মিলনের আনন্দে হ্যামলেট সে পরীক্ষা করলেন না।

শুরু হল তলোয়ার খেলা। দুজনেই পাকা খেলোয়াড়। ক্রমশ খেলার উত্তেজনায় তাঁরা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এই জাতীয় খেলার নিয়ম হল - কেউ কাউকে জোর আঘাত করবে না। হ্যামলেট অক্ষরে অক্ষরে সে নিয়ম পালন করতে লাগলেন।

আজ ক্লডিয়াসের পাশে রাণীও এসে বসেছেন। যদিও তিনি ক্লডিয়াসের পাপের সঙ্গিনী কিন্তু আজকের চক্রান্তের কথা ক্লডিয়াস তাঁকে জানান নি। কারণ তিনি জেনেছেন, হ্যামলেট সুস্থ প্রকৃতিস্থ ভাবে তাঁর মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং রাণীর হৃদয় মাতৃস্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

সত্যই রাণী সেই হ্যামলেটের প্রতি শুভকামনায় আকুল। হ্যামলেট জিতছে দেখে তাঁর কী আনন্দ। হ্যামলেট ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখে বিরামের সময় রাণী তাড়াতাড়ি উঠে নিজের ওড়না দিয়ে পুত্রের কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলেন। হ্যামলেট তৃষ্ণার্ত হয়েছেন দেখে ক্লডিয়াসকে বললেন, হ্যামলেটের পানীয় দাও।

ক্লডিয়াস এই মুহূর্তটির জন্যই তৈরী হয়েছিলেন। বিষ মেশানো পাত্রটা রাণীর হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে খেলা পুনরারম্ভের বাজনা বেজে উঠলে হ্যামলেট তাড়াতাড়ি মঞ্চের দিকে চলে গেলেন।

রাণী নিজে খেলা দেখার উত্তেজনায় তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই পাত্রটি ফিরিয়ে না দিয়ে নিজেই পান করলেন। বারণ করবার

আগেই ক্লডিয়াস দেখলেন, সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। তিনি কল্পনা করতে পারেন নি, ব্যাপারটা এভাবে ঘটবে। তিনি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন।

এদিকে লিয়ার্টিস উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। সুযোগ পেয়ে তিনি হ্যামলেটকে জোরে আঘাত-করলেন। হ্যামলেট বলে উঠলেন এটা কি হল বন্ধু।

অনুতাপের ভঙ্গীতে লিয়ার্টিস বললেন, উত্তেজনার বশে ভুল হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে লিয়ার্টিস আবার হ্যামলেটের অঙ্গে সজোরে তরবারি বসিয়ে দিলেন। তখন আর হ্যামলেট নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এক আঘাতে লিয়ার্টিসের তরবারি তার হাত থেকে ছিটকে ফেলে দিলেন, তারপর সেই তরবারি নিয়ে লিয়ার্টিসের বুকে আঘাত হানলেন।

এমন সময় দর্শকদের ভিতর আর্তনাদ উঠল। রাণী মূর্চ্ছা গিয়েছেন।

রাণীর দেহে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। রাণী বুঝতে পেরেছেন, যে পাত্র তিনি হ্যামলেটকে দিতে গিয়ে নিজেই পান করেছেন তাতে বিষ মেশানো ছিল। রাণী বলে উঠলেন, মূর্চ্ছা নয়। আমি মরছি। বিষ! বিষ! হ্যামলেটের পাত্রে বিষ ছিল। হ্যামলেট। আমি চললাম।

হ্যামলেট অবাক হয়ে রাণীর কাছে ছুটে গেলেন। রক্ত ঝরা দেহ নিয়ে লিয়ার্টিস বলবেন, বন্ধু, আর আধঘণ্টার মধ্যে তুমি আর আমি দুইয়ের কেউই এ পৃথিবীতে থাকবো না। আমার পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি। যে তলোয়ারে আমি তোমায় আঘাত করেছি তাতে বিষ লাগানো ছিল। ঐ, ঐ, ক্লডিয়াস…

বলতে বলতে লিয়ার্টিস চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেলেন।

হ্যামলেট তখন সত্যিই উন্মাদের মতো হয়ে গেলেন। চিৎকারের

সঙ্গে তিনি সেই বিষ মাখানো তলোয়ার ক্লডিয়াসের বুকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এই বিষ তুমিই ছড়িয়েছো—তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লডিয়াস আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন এবং কয়েক লহমার মধ্যে মারা গেলেন।

চারিদিকে মৃত্যু। উৎসব ক্ষেত্র যেন শ্মশান। হ্যামলেট বুঝতে পারছেন, তাঁরও মৃত্যু ঘটতে আর বিলম্ব নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেউ তাঁর আপনজন নেই এ পৃথিবীতে একমাত্র বন্ধু হোরেশিও ছাড়া। তাই শেষ মুহূর্তে হোরেশিওর কোলে মাথা রেখে বললেন, বন্ধু হোরেশিও, একমাত্র তুমিই রইলে জগৎকে ডেনমার্কের হতভাগ্য যুবরাজের করুণ কাহিনী শোনাবার জন্যে। বিদায় বন্ধু, বিদায়।

লা মিজারেবল : হুগো

ফরাসী সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ভিক্টর হুগোর নাম। তাঁর বহু রচনা। বহু বিচিত্র তাঁর সাহিত্য সম্ভার। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটি জগৎ-সাহিত্য সভার সামনের সারিতে আসন লাভ করেছে। আজও পর্যন্ত সে আসন অটুট। এই প্রচণ্ড-অনুভূতিপ্রবণ উপন্যাসে ভিক্টর হুগো মানুষকে দেখেছেন তার ভাল এবং মন্দ দু'দিক থেকে, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের পক্ষে সওয়াল করেছেন, সমাজের চোখে যারা হীন, সমাজ-বিরোধী তাঁদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন মনুষ্যত্বের মহিমা। সেদিক থেকে লা মিজারেবেল এক অনন্য উপন্যাস।

॥ এক ॥

দারিদ্র্য। নিষ্করুণ, দুঃসহ দারিদ্র্য যা মানুষের চিত্ত বিকৃতি ঘটায়, মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। কোন সহানুভূতি নেই, কোন সাহায্য নেই, কোন দয়া মমতা নেই। তুমি দরিদ্র, অতএব তুমি জাহান্নমে যাও, খেতে না পেয়ে মরে যাও, সমাজের উপরতলায় তার কোন ছায়া পড়বে না।

এমনি দারিদ্র্যের কবলে পড়েছিল প্যারিস শহরের দুর্ভাগা বস্তিবাসী, জিন্ ভলজীন। অনেক চেষ্টা করল সে, অনেক লড়াই করল, কিন্তু তার দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলল। দু'বেলা থেকে একবেলা, তারপর সারা দিনই উপোস!

দুর্দান্ত শীত, তায় অনাহার। আয়ুষ্কাল বুঝি শেষ হোল তার। বাঁচার শেষ তাগিদ জাগল তার মনে। মরিয়া হয়ে একদিন একটা রুটির দোকানে ঢুকে একখানা রুটি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল।

ধরা তো পড়বেই। কারণ, সে তো পাকা পেশাদার চোর নয়!

তাই সহজেই ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাজত। সেখান থেকে আদালত। সংক্ষিপ্ত বিচার। প্রমাণ হাতে হাতে। অতএব জেল পাঁচ বছর। তার দুঃখের কাহিনী শুনে বিচারক মুখ বেঁকালেন শুধু, বললেন, ধরা পড়লে সকলেই ওইরকম বলে।

জেলে আহার পেয়ে ভলজীন চাংগা হয়ে উঠল। তারপর সে স্থির করল, জেলে সে থাকবে না। সে পালাবে।

কিন্তু জেল ভেঙে পালানো কি সহজ? ধরা পড়ল। জেলের মেয়াদ বেড়ে গেল। আবার চেষ্টা করল, আবার ধরা পড়ল, আবার মেয়াদ বাড়ল। এইভাবে সে কুড়ি বছর জেলবাসের পর ছাড়া পেল একদিন।

কোথায় আত্মীয় স্বজন? সব মরে লোপাট! কোথাও গিয়ে একবেলা থাকতে পারে এমন আশ্রয়ও একটা পাওয়া গেল না। উলটে লোক তার পোষাক আশাক আর চেহারা দেখে তাকে চোর গুণ্ডা ডাকাত মনে করে দূর দূর করে প্রতি পল্লী থেকে খেদিয়ে দিল।

কোন উপায় নেই। বাঁচবার আর কোন আশা নেই। আজ রাতেই শীতে আর অনাহারে সে মারা পড়বে নির্ঘাৎ। শেষকালে থানায় গিয়ে হাজির হল সে। তার অবস্থা জানিয়ে বললে, আজ রাতটা আমায় হাজতে থাকতে দিন। কাল সকালে উঠেই আমি চলে যাব।

থানাদার বললে, সে কেমন করে হবে? তুমি কোন অপরাধ না করলে তো তোমায় আমরা হাজতে দিতে পারি না।

হতাশ হল জিন। অদূরে ছিল একটি গীর্জা। সেখানে গিয়ে গেটের ধারে একটা পাথরের বেদীর উপর বসে পড়ল। শরীরে আর কোন শক্তি নেই। এইখানে বসে সে রাতটা কাটিয়ে দেবে। মরে তো এখানেই মরবে।

একটু পরে এক মহিলা গির্জা থেকে বেরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে তার অবস্থা শুনে বললেন, গির্জার পাশেই বিশপের বাড়ী। তুমি সেখানে যাও। নিশ্চয় আশ্রয় পাবে।

জিনের বিশ্বাস হলনা। কোন মানুষের কাছে তার কোন প্রত্যাশা নেই। তবুও শেষ আশা নিয়ে সে বিশপের বাড়ী উপস্থিত হল। বিশপ তখন বৈঠকখানায় বসে বই পড়ছিলেন। দরজায় মানুষের সাড়া পেয়ে বললেন, ভিতরে আসুন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে জিন এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, আমি একজন জেল ফেরং আসামী। কুড়ি বছর জেল খাটার পর ছাড়া পেয়েছি। কোথাও কোন আশ্রয় চাই, আর কিছু খেতে চাই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

বিশপ তাড়াতাড়ি বললেন, বসুন, বসুন আশ্রয় পাবেন বৈকি!

বিশপের স্ত্রীপুত্র ছিল না। তাঁর সংসারে ছিল তাঁর ভগ্নী। তিনিই সংসার চালনা করতেন। তাঁকে ডেকে বিশপ বললেন, একজন অতিথি এসেছেন। তিনি আমার সঙ্গে খাবেন। সেইমত ব্যবস্থা কর। আর অতিথির সম্মানে আজ রূপেরে বাসনগুলো বার কর।

জিনের চেহারা আর পোষাক দেখে ভগ্নী অবাক! এই লোক আবার মাননীয় অতিথি! যাই হোক, তিনি দাদার কথামত ব্যবস্থা করলেন। বিশপ আর জিন দু'জনে একত্রে আহার করল। এত সব ভাল খাবার জিন জীবনে খায় নি। সে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল সব।

খাওয়া শেষ হলে বিশপ জিনকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই ঘরে বিছানা পাতা আছে। আপনি শ্রান্ত। শুয়ে পড়ুন।

এই বলে বিশপ চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ী নিস্তব্ধ হল। সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জিনের চোখে ঘুম নেই। কুড়ি বছর ধরে সে জেলের পাথরের মেঝেতে শুয়ে কাটিয়েছে, এত নরম বিছানায় তার ঘুম হবে কেন? তার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। উঠে বসল সে। মনে পড়ল, রূপোর বাসনগুলোর কথা, পাশের ঘরের আলমারিতে সেগুলো রয়েছে। আলমারিতে চাবি নেই। খুব সোজা কাজ। গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। কেউ জানতে

পারবে না! লোভ! সাংঘাতিক মনোবৃত্তি! জিন ভলজীন লোভে পড়ল। শেষ রাত্রে উঠে পাশের ঘর থেকে সব বাসনগুলো একটা পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল! সদর দরজাতেও কোন চাবি লাগানো ছিল না। বিশপের বাড়ীতে কোন দরজাতেই চাবি লাগাবার রেওয়াজ ছিল না।

সকালবেলা বাসন চুরি গেছে দেখে বিশপের কোন ভাবান্তর নেই। বললেন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, অত বিলাসিতা আমার সাজে না, তাই ভগবান ওকে বাসনগুলো দিয়েছেন। ভালই হয়েছে।

জিন বাসনের পুঁটলি নিয়ে বেশিদূর যেতে পারল না। একে তার ওই চেহারা, তার ওপর কাঁধে একটা নতুন কাপড়ের পুঁটলি। রাস্তার পুলিশ তাকে দেখে সন্দেহ করে তার পুঁটলি খুলে তল্লাস করল।

এতো রূপোর বাসন! কোথায় পেলে তুমি?

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে জিন কাঁপা গলায় বললে, বিশপ আমায় দিয়েছেন।

হঠাৎ এতগুলো বাসন তোমায় দিলেন? আচ্ছা চল তাঁর কাছে। এখনি মীমাংসা হবে।

যাক, তাহলে আবার জেলে যেতে হবে। ভালই হবে, ভাবল জিন। জেলে গেলে না খেয়ে মরতে হবে না।

জিনকে নিয়ে পুলিশ এলো বিশপের বাড়ী।

বিশপ বেরিয়ে এসে জিনকে দেখে সঙ্গের পুলিশকে বললেন, ব্যাপার কি? ওকে ধরে এনেছো কেন?

ওর কাছে অনেকগুলো বাসন পাওয়া গেছে। লোকটা বলছে, আপনি নাকি সেগুলো ওকে দিয়েছেন। তাই সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে এসেছি।

বিশপ শান্তকণ্ঠে বললেন, ও সত্যি কথাই বলেছে। ওগুলো আমি ওকে দিয়েছি।

তারপর জিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বন্ধু এই সঙ্গে রূপোর

বাতিদান দুটোও তোমায় দিয়েছিলাম। সে দুটো নাও নি কেন? একটু দাঁড়াও, সে দুটো তোমায় এনেদি।

এই বলে তিনি ঘর থেকে দুটো রূপোর বাতিদান এনে জিনের হাতে দিলেন।

পুলিশ ফিরে চলে গেল। জিন ভলজীন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বিশপ বললেন, যাও বন্ধু, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, এখন থেকে তোমার জীবন সৎপথে চলুক। তোমার দ্বারা যেন মানুষের উপকার হয়।

॥ দুই ॥

অভিভূতের মতো জিন ভলজীন রাস্তা দিয়ে চলেছে। সে ভাবছে বিশপের মহত্বের কথা। এমন মানুষও এ পৃথিবীতে আছে? তার মনের মধ্যে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে! চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে সে গ্রামের প্রান্তে একটা সাঁকোর ধারে গিয়ে বসল। সেই সময় একটি ছেলে একটা টাকা লুফতে লুফতে সেখান দিয়ে দোকানে যাচ্ছিল। সাঁকোর কাছে এসে হঠাৎ টাকাটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে এসে পড়ল জিনের পায়ের কাছে। আর জিন অন্যমনস্ক হয়ে টাকাটার উপর পা চাপিয়ে দিল।

ছেলেটা এগিয়ে এসে জিনের পা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

এই! কি হচ্ছে! ধমক দিয়ে উঠল জিন।

আমার টাকা! দাওনা! কেন দিচ্ছ না!

জিন তখন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। ছেলেটার কথায় বিরক্ত হয়ে আবার ভীষণ এক ধমক দিল। তার চেহারা দেখে আর হুঙ্কার শুনে ছেলেটা ভয়ে সেখান থেকে পালালো।

কিছুক্ষণ পরে জিন যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখল, তার ডান পায়ের

নীচে একটা টাকা! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার কথা তার মনে পড়ল। দারুণ অনুশোচনায় বিহ্বল হোয়ে সে টাকাটা হাতে নিয়ে ছেলেটার উদ্দেশ্যে ছুটল। কিন্তু তার দেখা পেল না। গভীর অনুতাপে কেঁদে ফেলল জিন ভলজীন।

তারপর একটা বড় শহরে গিয়ে সে একটা কারখানা স্থাপন করল। তার হাতে তখন অনেক টাকা। রূপোর বাসনগুলো বিক্রী করে অনেক টাকা পেয়েছে সে।

দেখতে দেখতে তার কারখানা বড় হয়ে উঠল। অনেক লোক খাটতে লাগল। অনেক টাকা আয় হোতে লাগল। কিন্তু জিনের মধ্যে ইতিমধ্যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। টাকার প্রতি তার আর আগেকার মতো লোভ নেই। সে দান করে অকাতরে। কর্মচারীদের প্রতি সব সময় সদয় ব্যবহার করে। কোন দুঃখী আতুর তার কাছে বিমুখ হয় না। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নাম নিয়েছিল সে, ম্যাডেলিন। লোকে শ্রদ্ধা করে বলত ফাদার ম্যাডেলিন।

জিনের কারখানায় জ্যাভার্ট নামে একজন লোক কাজে ঢুকেছিল। আসলে সে ছিল পুলিশের দারোগা, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ সৎ কর্মী। জিনের প্রতি তার বরাবরই একটা সন্দেহ ছিল। তাই সে তার আসল রূপ জানবার জন্যে তার কারখানায় কাজ নিয়েছিল।

ফ্যানটাইন বলে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক ছিল জিনের কারখানায়। তার একটি মেয়ে ছিল, নাম কসেটি। মেয়েটিকে তার মা বিদেশে এক দোকানদারের কাছে রেখেছিল এবং তার নামে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতো। হঠাৎ কঠিন অসুখে ফ্যানটাইন মারা গেল। মৃত্যুর আগে সে জিনকে বলে গেল যেন কসেটির ভার জিন নেয়। জিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্যানটাইনকে মৃত্যুর সময় সান্ত্বনা দিল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে জ্যাভার্ট জিনের কাছে এসে বললে, আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন আপনি!

বিস্মিত হয়ে জিন বললে, কেন? কি দোষ করেছো তুমি?

জ্যাভার্ট বললে, জিন ভলজীন নামে এক দাগী আসামী ছিল। একটা ছোট ছেলের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার জন্যে তার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছিল। আমি আপনাকেই জিন ভলজীন মনে করে আপনাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সদর থানায় লিখেছিলাম।

রুদ্ধশ্বাসে জিন প্রশ্ন করল তারপর?

জ্যাভার্ট বললে, সদর থানা থেকে খবর এসেছে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কেন না জিন ভলজীন ধরা পড়েছে। আগামী-কাল তার বিচার হবে।

জিন হেসে বললে, এই ব্যাপার! আচ্ছা, তুমি এখন যাও। কাজ কর গে।

জ্যাভার্ট চলে গেল। জিনের অন্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন! তার জন্যে একজন নির্দোষী সাজা পাবে? তা সে সইতে পারবে না। সত্য পরিচয় দিলে, তার এই বিপুল মান সম্মান অর্থ সবই এক নিমেষে চলে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বিশপের কথা মনে পড়ল, তোমার দ্বারা যেন মানুষের উপকার হয়।

টাকাকড়ি যেখানে যা ছিল সব একটা গুপ্তস্থানে রেখে পরদিন জিন সদর থানায় গিয়ে উপস্থিত হল। আসামীর কাঠগড়ার সামনে গিয়ে সে যখন নিজের পরিচয় ঘোষণা করল তখন সারা আদালত চমৎকৃত, ফাদার ম্যাডেলিন, ধার্মিক দয়ালু, ভক্তিভাজন, পরোপকারী ফাদার ম্যাডেলিন আসলে জিন ভলজীন, এক জেল-ফেরৎ দাগী চোর!

বিচারক স্তম্ভিত! আদালত স্তব্ধ! নির্দোষী লোকটি ছাড়া পেল। কিন্তু জিন ভলজীনকে কেউ গ্রেপ্তার করল না। সে আদালতের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

জ্যাভার্টও এসেছিল আদালতে। সে কিন্তু জিনকে রেহাই দিল না। কর্তব্য তাকে করতেই হবে। জিন ভলজীন মহৎলোক সন্দেহ নেই, কিন্তু আইনের চোখে সে অপরাধী। অতএব জ্যাভার্ট তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিল।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই খবর পাওয়া গেল, একটা জাহাজে কাজ করবার সময় পালাতে গিয়ে জিন ভলজীন সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে।

। তিন ।

দূরবর্তী এক শহরে আবার জিন ভলজীনকে দেখা গেল এক নতুন আনন্দময় পরিবেশে! ইতিমধ্যে ফ্যানটাইনের মেয়ে কসেটিকে সে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। কসেটিকে নিয়ে জিন মহা আনন্দে আছে। দশ বছরের মেয়েটি তার প্রাণ! আর কসেটিও এতদিন অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরিবেশে অত্যাচারের মধ্যে ছিল, এখন নতুন জীবন পেয়ে সে যেন বেঁচে উঠেছে। নিজের বাপের মতোই জিনকে ভালবাসে, ভক্তি করে।

নিরাপদে এবং পরম সুখে দেখতে দেখতে পাঁচ ছ' বছর কেটে গেল। কসেটি যৌবনে পা দিল। অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠল সে। সেই অঞ্চলে ছিল এক ধনী ব্যারন। তাঁর ছেলে মেরিয়াসের সঙ্গে কসেটির পরিচয় হল এবং প্রথম দেখাতেই দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে ফেললো।

একদিকে যেমন আনন্দিত হল জিন, অন্যদিকে কাতর বোধ করল তেমনি। মেরিয়াসের সঙ্গে কসেটির বিয়ে হবে, এতো মহাআনন্দের কথা। কিন্তু বিয়ে হলে কসেটি আর তার কাছে থাকবে না, এই দুঃখে জিনের বুক যেন ভেঙে পড়ল! কিন্তু উপায় নেই। কসেটিকে সুখী করতে হবে! সেজন্যে নিজের সুখের কথা ভাবলে তো চলবে না।

ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লব শুরু হোয়ে গেল এবং মেরিয়াসও সেই বিপ্লবে যোগ দিল। প্যারিসের রাস্তায় যেসব খণ্ডযুদ্ধ চলল তার মধ্যে মেরিয়াস এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। তার যাতে কোন বিপদ না ঘটে সে জন্যে জিন সর্ব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতো, তার পিছনে পিছনে ঘুরতো।

এই সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। ইন্সপেক্টার জ্যাভার্ট রাজার তরফে বিদ্রোহীদের দমন করবার কাজে নিযুক্ত ছিল, হঠাৎ সে বন্দী হল তাদের হাতে এবং বিদ্রোহীরা তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল।

জিনকে বিদ্রোহীরা জানতো একজন পরোপকারী মানুষ বলে, তারা তাকে শ্রদ্ধা করত খুব। তাই জিন যখন তাদের কাছে গিয়ে বললে যে সে নিজের হাতে জ্যাভার্টকে গুলি করে মারবে, তখন তারা কেউ আপত্তি করল না, বিনা দ্বিধায় জ্যাভার্টকে জিনের হাতে ছেড়ে দিল।

জ্যাভার্টকে নিয়ে জিন একটু দূরে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর তার হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে বললে, তুমি এইদিক দিয়ে চলে যাও, এদিকটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর, এরপর যদি আমায় গ্রেপ্তার করতে চাও তো এই ঠিকানায় গিয়ে আমার খোঁজ কোরো। আমি থাকবো।

জিনের আচরণে জ্যাভার্ট বিহ্বল হতভম্ব হয়ে গেল। ঠিকানা জেনে নিয়ে সে চলে গেল। জিন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলো। বিদ্রোহীরা তখন চারদিকে পালাচ্ছে। রাজার সৈন্যরা তাদের তাড়া করছে, তারা বেপরোয়া গুলি ছুঁড়ছে। চতুর্দিকে ভীষণ চিৎকার, গোলমাল, ছুটোছুটি।

তারই মধ্যে গুলি লেগে মেরিয়াস সাংঘাতিক জখম হল। দূর থেকে দেখতে পেয়ে জিন ছুটে তার কাছে গেল এবং তার অচেতন দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে কোন রকমে একটা নর্দমার ভিতর দিয়ে পালালো। রাজার সৈন্যরা তখন হৈ হৈ করে অন্যদিকে ছুটে চলেছে।

কিছুদূর গিয়ে নিরাপদ জায়গায় পেীছে জিন নর্দমা থেকে উঠে এলো। তার কোলে সংজ্ঞাশূন্য মেরিয়াস।

নর্দমা থেকে উঠেই জিন চমকে উঠল। তার সামনে দাঁড়িয়ে, ইন্সপেক্টার জ্যাভার্ট। প্রথমটা তু'জনেই যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারপর ধীর শান্ত গলায় জিন বললে, দয়া করে যদি আমার

সঙ্গে আস, তাহলে এই আহত লোকটিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে থানায় যেতে পারি।

জ্যাভার্ট কোন কথা না বলে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। তার মন তখন এক বিষম দ্বিধা দ্বন্দ্বে আলোড়িত!

মেরিয়াসকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে জিন বললে, আমার নিজের বাড়িতে দু'মিনিটের জন্যে একবার যেতে পারি কি?

জ্যাভার্ট ঘাড় নেড়ে বললে, চল।

জিন নিজের বাড়ি গিয়ে ভিতরে চলে গেল। জ্যাভার্ট দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। বাড়িতে গিয়ে কাগজপত্রগুলো কসেটির হাতে দিয়ে মেরিয়াসের আঘাতের কথা তাকে জানিয়ে জিন নীচে নেমে এলো।

কিন্তু কোথায় জ্যাভার্ট। সে চলে গেছে!

রাস্তায় যেতে যেতে অস্থির বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগল কঠিন-হৃদয় কর্তব্যপরায়ণ পুলিস ইন্সপেক্টার জ্যাভার্ট! মানুষের জীবনে শুধু কর্তব্য পালনই কি সবচেয়ে বড় কথা? কৃতজ্ঞতার দাম নেই? যে লোকটি তাকে পরমশত্রু জেনেও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচালো, সেই মহানুভব মানুষকে সে জেলে নিয়ে যাবে কোন্ প্রাণে? কিন্তু সে সরকারের চাকর! জেনেশুনে হাতে পেয়ে সে জিনকে ছেড়ে দেবেই বা কেমন করে? তাহলে যে নিমকহারামী করা হবে! কিন্তু না। জিন-কে সে ধরতে ফিরে যাবে না। তাহলে সে কি সরকারের কাছে অপরাধী হবে না?

ভেবে কুল কিনারা পেল না জ্যাভার্ট। কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে সে জীবন-যাপন করতে পারবে না! আবার জিনকে সে গ্রেপ্তার করতে পারবে না! একদিকে কর্তব্যনিষ্ঠা—অপর দিকে বিবেক! এ সমস্যার সমাধান করতে পারলো না জ্যাভার্ট। অবশেষে এই মানসিক দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে সে সীন নদীর জলে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই মেরিয়াস সম্পূর্ণ সেরে উঠল, তারপর

এক শুভলগ্নে কসেটির সঙ্গে তার বিয়ে হোয়ে গেল। জিন তার জীবনের সব কথাই মেরিয়াসকে বলেছিল। মেরিয়াস সব জেনে বিয়েতে আপত্তি করে নি বটে, কিন্তু বিয়ের পর কসেটিকে আর বড় একটা জিনের কাছে পাঠাতো না, নিজেও যেতো না তার কাছে।

তারপর যেদিন মেরিয়াস শুনল যে বিপ্লবের সেই দারুণ দিনে জিনই তার প্রাণ রক্ষা করেছিল তখন সেই দিনই সে কসেটিকে নিয়ে জিনের কাছে গেল। এতবড় একজন মহাপ্রাণ মানুষের প্রতি সে অবিচার করেছিল, তাই তার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে মনে মনে ব্যাকুল হোয়ে উঠেছিল মেরিয়াস।

কিছুদিন ধরেই জিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

যখন মেরিয়াস আর কসেটি তার কাছে এলো তখন জিন মৃত্যুশয্যায়।

কসেটি আর মেরিয়াসকে দেখে তার মুখে করুণ মধুর হাসি ফুটে উঠল। দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করে জিন ভলজীন চিরদিনের মত চোখ বুজলো।

তার সেই মৃত্যু-শান্ত মুখ দেখে মনে হল যেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড : ষ্টিভেনসন

[স্কটল্যাণ্ড নিবাসী রবার্ট লুই স্টিভেনসনকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীরূপে গণ্য করা হয়। তিনি বহু উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। তার মধ্যে তাঁর 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' উপন্যাসটি সবচেয়ে বিখ্যাত। এই বইটি পৃথিবীর সকল ভাষাতে অনূদিত হয়েছে এবং সব দেশেই সমাদর লাভ করছে। এটি মূলত একটি এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। কিন্তু লেখার গুণে কাহিনীটি ক্লাসিক-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।]

॥ এক ॥

সমুদ্রের ধারে একটি সরাইখানা। নিতান্ত সাধারণ ছোট পান্থশালা। মালিক নিজেই সরাইখানার কাজকর্ম দেখাশোনা করে। তাকে সাহায্য করে তার স্ত্রী এবং বার বছরের ছেলে জিম। কোন রকমে তাদের দিন চলে।

সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের লোকেরা তাদের ভালবাসে। সন্ধ্যার পর অনেকেই সরাইখানায় আসে, খায় দায়, গল্পগুজব করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই সরাইখানায় এসে উপস্থিত হল এক বৃদ্ধ জাহাজের কাপ্তেন। তার পিছনে মুটিয়ার মাথায় প্রকাণ্ড একটা বাক্স।

বুড়ো এসে সরাইখানায় একটা ঘর নিল। ব্যস। তারপর দিনের পর দিন কেটে যায়, বুড়োর নড়বার নাম নেই। এখানেই যেন তার মৌরসী পাট্টা। যেমন তার রুক্ষ চেহারা, তেমনি উগ্র মেজাজ। লোকটা অনবরত মদ গিলতো, যখন তখন চিৎকার করে গান গাইত, যাকে তাকে ধরে ধমক দিত আর মাঝে মাঝে সমুদ্রের

ধারে গিয়ে চোখে দুরবীণ লাগিয়ে বসে থাকতো। লোকটাকে সবাই যমের মত ভয় করত। কেবল সরাইখানার মালিকের ছেলে জিম ছিল তার প্রিয়পাত্র। প্রথম থেকেই জিমের উপর লোকটার প্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছিল। একমাত্র জিমই যখন তখন তার কাছে যেতো এবং সময় মতো তাকে খাবার দাবার দিত। অন্য কেউ তার কাছে ঘেসতো না।

প্রথম প্রথম লোকটা তার আহার এবং বাসস্থান বাবদ পাওনা নিয়মিত প্রত্যহ চুকিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কয়েকদিন পর থেকেই টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করল। সরাইখানার মালিক পাওনা চাইতে গেলে লোকটা এমনভাবে খিঁচিয়ে উঠে হুঙ্কার ছাড়তো যে মালিক বেচারা ভয়ে সরে পড়ত।

লোকটা জিমকে মাঝে মাঝে দু'এক পয়সা বকশিস দিত। বিনা কারণে অবশ্য দিত না। সে জিমকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিত। যখন সে স্নান করতে, খেতে বা বিশ্রাম করতে সরাইখানার ভিতর যেতো, তখন জিমের উপর ভার দিয়ে যেতো, একটা এক-পেয়ে খালাসী সরাইখানার দিকে আসছে কি না, তা দেখা এবং দেখা পেলেই তাকে খবর দেওয়া।

এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। জিমের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। একদিন সে মারা গেল।

জিম ছেলেমানুষ, তার মা শোকে কাতর, এদিকে ওই বুড়ো কাপ্তেন। খায় দায় কিন্তু এক পয়সা দেয় না। তাদের অবস্থা শোচনীয় হোয়ে উঠল।

সেই গ্রামে লিভ্জে নামে এক ডাক্তার ছিলেন। তিনি জিম এবং তার মায়ের দেখাশোনা করতেন। তিনি তাদের বিপদে সান্ত্বনা দিলেন, ভরসা দিলেন, যা হয় একটা উপায় তিনি তাদের জন্যে করে দেবেন, আশ্বাস দিলেন।

এমন সময় একদিন সরাইখানায় হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় একজন অন্ধ সরাইখানায় এসে হাজির হল। জিমকে বললে, আমায় এখুনি কাপ্তেনের কাছে নিয়ে চল।

জিম কিছুই জানতো না। সে তার হাত ধরে সরাইখানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে কাপ্তেনের ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিলে। কাপ্তেন তখন ঘুমুচ্ছিল। মানুষের সাড়া পেয়ে ঘুম থেকে উঠে অন্ধ লোকটাকে দেখেই কাপ্তেনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

অন্ধ লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়েই বেরিয়ে চলে গেল। বোঝা গেল, লোকটা সম্পূর্ণ অন্ধ নয়।

এদিকে কাপ্তেন সেই কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে আপনমনে বিড়বিড় করে কয়েকবার বললে, দশটা পর্যন্ত সময় আছে। দশটা পর্যন্ত! তাই তো! কি করা যায়।

এইভাবে বকতে বকতে সে জিমের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, এখনো সময় আছে। আমি ওদের হাত এড়াতে পারি। দশটা পর্যন্ত। শোন, তোমায় একটা কথা বলি।

এই বলে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে যেমন ঘর থেকে বেরুতে যাবে অমনি হঠাৎ টলে পড়ে গেল।

জিমের চিৎকারে জিমের মা এঘরে এলো। দু'জনে লোকটাকে তুলে বিছানায় শোয়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটার সর্ব শরীর তখন কাঠ। সে মরে গেছে।

॥ দুই ॥

ব্যাপার দেখে মা আর ছেলে দুজনেই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল।

কাপ্তেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জিম বুঝেছিল, তার ওই পেল্লায় সিন্দুকটার মধ্যে এমন কোন জিনিষ আছে যার উপর অনেকেরই লোভ।

জিম তার মাকে বললে, মা এক কাজ করি, সিন্দুকটার মধ্যে কি আছে, দেখি।

তার মা বললে, হ্যাঁ, আমাদের পাওনা তো অনেক হয়েছে, যদি সিন্দুকের ভিতর কিছু টাকা পাওয়া যায়। এই বেলা বরং ওটা খুলে দেখা যাক।

জিম বললে, মা, আর এক কাজ করি। ডাক্তার সাহেবকে খবর দি। তিনি থাকলে, পরে কোন গোলমাল হবে না। তিনি তো আবার ম্যাজিস্ট্রেট, তাই তিনি থাকলে আমাদের সুবিধা হবে।

এই বলে জিম সরাইখানা থেকে বেরিয়ে একটি লোককে ডেকে তাকে দিয়ে ডাক্তার লিভজেকে খবর পাঠিয়ে দিলে যে সরাইখানায় একটা লোক মারা গেছে, তিনি যেন শিগ্‌গির একবার আসেন।

তারপর ফিরে এসে কাপ্তেনের জামার পকেট থেকে সিন্দুকের চাবী বার করে সিন্দুকটা খুলে ফেলল। উপরে কতকগুলো নতুন পোষাক! তার নীচে কতক গুলো টুকিটাকি জিনিষ। তার তলায় একটা ছোট পুঁটলিতে অনেকগুলো গিনি আর অয়েল ক্লথ জড়ানো এক তাড়া কাগজ পত্র। জিম বুঝল, এই কাগজের বাণ্ডিলটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান। সে সেটা উঠিয়ে নিলে। তারপর মাকে বললে, চল, গিনির থলিটা নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি।

কিন্তু তার মা তাতে রাজী হল না। সে বললে, তাদের যা পাওনা তার চেয়ে এক আধলা বেশি নেবে না। তারা গরীব বটে কিন্তু চোর নয়। এই বলে জিমের মা তাদের পাওনা হিসাব করতে বলল।

এদিকে সরাইখানার বাইরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা। তখন মা আর ছেলে দুজনে ভয় পেয়ে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে পিছনকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং কিছুদূরে গিয়ে একটা ছোট পুলের তলায় আত্মগোপন করে রইল।

সরাইখানার সামনে তখন হৈ-হৈ রব উঠেছে। জিম ভিতরে

আসবার আগে সামনের দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই অন্ধ লোকটার গলা শোনা গেল— দরজা ভেঙে ফেল, দরজা ভেঙে ফেল।

দরজা ভাঙতে তাদের বেশি সময় লাগল না। পুরনো নড়বড়ে দরজা, দুচার ধাক্কাতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ভিতরে ঢুকে একজন বলে উঠল, এই যে বিল্, মরে পড়ে আছে।

অন্ধ লোকটা বললে, সিন্দুকটা কোথায়? সেটা দেখ।

একজন সিন্দুকের কাছে গিয়ে তার ডালা খুলে ভিতরকার জিনিস পত্র খানাতল্লাসী করে বললে, নক্সাটা নেই।

শুনেই অন্ধ লোকটা যেন ক্ষেপে গেল। সে অকথ্য ভাষায় তার সঙ্গীদের গালমন্দ করতে লাগল। তখন তার সঙ্গীরাও রেগে গেল এবং দারুণ বচসা, সেই সঙ্গে মারামারি লেগে গেল।

এমন সময় পথের ধারে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। পুলিসের গাড়ী, লোকগুলো ভাবল, ম্যাজিস্ট্রেট আসছে। মুহূর্তে মারামারি থেমে গেল, তারপর লোকগুলো যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

অন্ধ লোকটা কিন্তু পালাতে পারল না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হবার জন্যে সে যেমন ছুটে যাবে অমনি গাড়ীটা তার ঘাড়ে এসে পড়ল।

কতকগুলো পুলিশ আসছিল সেই গাড়ীতে। তারা নেমে প্রথমে অন্ধ লোকটার মৃতদেহ পথের ধারে সরিয়ে রাখল, তারপর সরাইখানায় ঢুকে বিলের মৃতদেহ দেখে সেটাকেও বাইরে বার করে আনল।

জিম তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়ে সে তাদের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে চলল। যে কাগজপত্রগুলো সে পেয়েছিল সেগুলো নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে জিম সেগুলো ডাক্তারের হাতে দিতে মনস্থ করল।

জানা গেল, ডাক্তার লিভ্জে জমিদারের বৈঠকখানায় বসে গল্প করছেন। জিম সোজা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বিলের মৃত্যু, ডাকাতদের

বাড়ী আক্রমণ প্রভৃতি সকল কথা খুলে বলল এবং সেই কাগজের মোড়কটা ডাক্তারের হাতে দিল।

ডাক্তার পুলিশদের বললেন, তোমরা মৃতদেহ দু'টোর ব্যবস্থা করগে আর জিমের বাড়ীতে পাহারা বসাও। ডাকাতরা আবার আসতে পারে।

পুলিশের দল চলে গেল। ডাক্তার আর জমিদার তখন আগ্রহের সঙ্গে কাগজের মোড়কটা খুললেন। তার ভিতর থেকে বেরুলো একটা ম্যাপ। সেই নক্‌সায় একটা দ্বীপের ভিতরকার একটি রত্ন গুহার নির্দেশ আঁকা। দ্বীপটি সমুদ্রের কোন্ জায়গায় অবস্থিত তারও নির্দেশ রয়েছে সেই ম্যাপে। দেখে ডাক্তার আর জমিদারের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

কাপ্তেন ফ্লিন্‌ট্ নামে এক জলদস্যু ছিল। বহু জাহাজ লুটপাট করে কাপ্তেন ফ্লিন্‌ট্ অনেক ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিল। মারা যাবার সময় সে সেই সব ধনরত্ন একটা অজ্ঞাত দ্বীপের এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই দ্বীপটা যে কোথায় তা তার সাঙ্গপাঙ্গরা বা অন্য কেউ জানতে পারেনি। শুধু একটা ম্যাপে সেই দ্বীপ এবং সেখানকার রত্নগুহার অবস্থান আঁকা ছিল। কাপ্তেন ফ্লিন্‌ট্ মারা যাবার পর সেই ম্যাপটা কাপ্তেন বিল্-এর হাতে পড়ে। সেই ম্যাপ নিয়ে সে জিমদের সরাইখানায় আসে এবং সেখানে হঠাৎ মারা পড়ে। কাপ্তেন ফ্লিন্‌টের অনুচরবর্গ সেই ম্যাপ্ উদ্ধার করতেই সরাইখানায় হানা দিয়েছিল। কিন্তু ম্যাপটা তারা পেল না। ম্যাপ গিয়ে পড়ল ডাক্তারের হাতে।

ম্যাপটা দেখে ডাক্তার আর জমিদার দু'জনেই মহা উত্তেজিত হলেন। তখনই স্থির হ'ল জমিদার মশায় ব্রিস্‌টলে গিয়ে একটি জাহাজ ঠিক করবেন এবং ডাক্তার এখান থেকে অভিযানের সকল ব্যবস্থা করবার দিকে নজর দেবেন। ঠিক হ'ল জিম তাঁদের সঙ্গে যাবে।

যদিও ব্যাপারটা তাঁরা খুব গোপন রাখবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন কিন্তু ব্রিসটলে পৌঁছবার পরেই জমিদারের অসাবধানতার ফলে অনেকেই জেনে গেল, তাঁরা বিখ্যাত জলদস্যু কাপ্তেন ফ্লিন্টের গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানে যাচ্ছেন।

তার ফল হ'ল এই যে সরাইখানায় যারা হানা দিয়েছিল তারাও খবরটা জানতে পারলো এবং তারা সকলে ভাল মানুষ সেজে চাকর বেয়ারার ছদ্মবেশে এসে জমিদার মশায়ের জাহাজে চাকরি নিল।

সেই দলে ছিল একজন একপেয়ে লোক। তাঁর নাম জন সিল্ভার। যুদ্ধে গিয়ে নাকি তার একটা পা কাটা গিয়েছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আর তার ব্যবহারে জমিদার এবং জাহাজের কাপ্তেন দু'জনেই মহা খুসী। জন সিলভারের মত আদবকায়দা দুরস্ত ভাল লোক বুঝি এ পৃথিবীতে আর নেই।

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে কাপ্তেন বিল সরাইখানায় পৌঁছে জিমকে একটা খালাসীর কথা বলেছিল। সেই লোকটাই এই একপেয়ে খালাসী এবং দলের সর্দার।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল। খবর পেয়ে জিমকে নিয়ে ডাক্তার লিভজে ব্রিসটলে গেলেন। তারপর একটা ভাল দিন দেখে যাত্রা আরম্ভ হ'ল।

॥ তিন ॥

জাহাজ যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে সেই সময় একদিন জিম ঘটনাচক্রে জন সিলভারের আসল মতলব জানতে পারল।

সেদিন গোটাকতক আপেলের দরকার হয়। জিম ডেকের উপর গিয়ে আপেলের পিপায় উঁকি দিয়ে দেখল, ফলগুলো একেবারে তলায় পড়ে রয়েছে। সে তখন পিপার মধ্যে নেমে ভাল আপেলগুলো বাছতে লাগল।

এমন সময় জন সিলভার তার দলের লোকদের নিয়ে সেখানে এলো এবং কেউ কোথাও নেই দেখে সেইখানে বসেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

পিপার মধ্যে বসে তাদের কথা শুনে জিম আতংকে বিহ্বল হ'ল। জন সিলভার তাহলে আসলে একজন ডাকাত-সর্দার! এরাও চলেছে গুপ্তধনের সন্ধানে আর এরা ডাক্তার এবং জমিদারকে মারবার ষড়যন্ত্র করছে! কী সর্বনাশ!

সিলভার এবং তার দলের লোকজন সেখান থেকে চলে যাবার পর জিম পিপা থেকে বেরিয়ে ডাক্তার এবং জমিদারের কাছে গিয়ে জন সিলভারের কথাবার্তাগুলো জানালো।

শুনে তারা তো স্তম্ভিত! কী করা যায়? তাঁরা জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নানা আলোচনার পর স্থির হ'ল, এখন চুপ করে থাকা যাক, দ্বীপে পৌঁছে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

যথাসময়ে দ্বীপের কাছে এসে জাহাজ নোঙর ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে সিলভারের দল তীরে নামবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। কাপ্তেনও তাদের কিছুক্ষণের জন্যে দ্বীপে বেড়িয়ে আসবার অনুমতি দিলেন।

তিন চার জন ছাড়া তারা সকলেই নেমে গেল। সেই সঙ্গে অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হোয়ে জিমও তাদের সঙ্গে ডাঙায় এসে অন্যদিকে উধাও হ'ল।

খানিকক্ষণ এধার ওধার ঘুরে এক জায়গায় এসে জিম সিলভারের গলার আওয়াজ পেয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল, টম্ নামে একটা জাহাজের খালাসীর সঙ্গে সিলভারের ঝগড়া লেগেছে। বোঝা গেল টম তাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজী নয়। যখন সে বললে যে জাহাজে ফিরে গিয়ে সে কর্তাদের সব কথা বলে দেবে তখন সিলভার রাগে উন্মত্ত হোয়ে তাকে খুন করে ফেলল। চোখের সামনে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিম অন্য দিকে দৌড় দিল!

কিছুদূরে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। আতংকে তার সর্ব শরীর কাঁপতে লাগল। তার সামনে দাঁড়িয়ে ও কে? মানুষ না অপ-দেবতা? কালো রং, ঝাঁকড়া চুল, এক মুখ গোঁফদাড়ি, পরণে শতচ্ছিন্ন ঢলঢলে পোষাক! কে এ?

লোকটা কিন্তু সত্যিই ভূত নয়! তার নাম বেন্‌গান্‌।

বেন্‌গান্‌ এক সময় জল-ডাকাত ছিল। জলদস্যুদের মধ্যে প্রথা আছে, দলের মধ্যে কেউ কোন অপরাধ করলে অপরাধীকে কোন নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেই রকম কোন একটা কারণেই তার দলের লোকেরা বৃদ্ধ বেন্‌গানকে এই দ্বীপে বছর দুই আগে ফেলে চলে গিছল।

প্রথমে দু'জনেই দু'জনকে দেখে খুব ভয় পেয়েছিল। তারপর জিম খানিকটা সাহসের সঙ্গে বেন্‌গানের সঙ্গে আলাপ করল। কথা-বার্তা বলে জিম বুঝবলা লোকটি ভাল এবং বহুদিন সে কোন ভাল খাবার পায়নি, বনের ফলপাকড় লতা পাতা খেয়েই জীবন ধারণ করে আসছে। জিম দয়া পরবশ হোয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের দিকে চলল। কিন্তু তীরে এসে জাহাজে পৌঁছানো সম্ভব হল না। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে তারা থমকে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ভীষণ গোলমাল শুরু হোয়ে গেছে।

॥ চার ॥

জিম জাহাজ থেকে চলে যাবার পর কাপ্তেন, ডাক্তার এবং জমিদার পরামর্শ করে ঠিক করলেন, দ্বীপটা একবার দেখে আসা দরকার। সিলভারের দলের যে ক'জন লোক জাহাজে ছিল তাদের উপর কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করে তাঁরা চুপি চুপি দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

দ্বীপের মধ্যে একটা সুরক্ষিত স্থান ছিল। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি আর তক্তা দিয়ে ঘেরা যেন ছোটখাটো একটা দুর্গ। বোধ হয় কাপ্তেন ফ্লিন্ট্-ই এই দুর্গ বানিয়েছিল। আস্তানাটা দেখে তারা স্থির করলেন—খাবার দাবার আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই খানেই ঘাঁটি করতে হবে।

জাহাজে ফিরে এসে একটা নৌকা করে তাঁরা জিনিসপত্র চালান দিতে লাগলেন। তারপর স্থির হল, এবার তাঁরা সকলেই জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে চলে যাবেন। জিমকে না দেখতে পেয়ে তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তবে তাঁদের আশা ছিল, জিম দ্বীপের মধ্যেই আছে এবং দ্বীপে পৌঁছে তাঁরা জিমকে খুঁজে পাবে।

কিন্তু এই ব্যবস্থা সহজ হল না। সিলভারের লোকজন যারা জাহাজে ছিল তারা তাদের মতলব বুঝতে পেরে, যেমন তাঁরা দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন অমনি জাহাজের উপর থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

আর ওদিকে বন্দুকের শব্দ পেয়ে সিলভারের দলও তীরে এসে জমায়েৎ হল। সমূহ বিপদ। যাকে বলে, জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, সেই অবস্থা।

যাই হোক, কোন রকমে খানিকটা দূরে নৌকো ভিড়িয়ে তাঁরা অক্ষত অবস্থায় দুর্গে পৌঁছলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। দু'একজন জখমও হল।

জিম আর বেনগান ইতিমধ্যে ছুটতে ছুটতে সেই দিকেই এসে পড়েছিল এবং নিজেদের দলের লোক দেখে তাদের সঙ্গে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

প্রায় তিনমাস ধরে লড়াই চলল। দু' পক্ষেরই কয়েকজন হতাহত হল।

ইতিমধ্যে সিলভার চালাকি করে একটা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, কোন রকমে ছলচাতুরির দ্বারা রত্ন-গুহার প্ল্যানটা সংগ্রহ করা। কিন্তু কাপ্তেন তাকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন আবার লড়াই চলল। কয়েকদিন দু'তরফ থেকেই গুলি বিনিময় হল। তারপর চুপচাপ।

ডাক্তারের দল দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ। সিলভারের দল মধ্যে।

ক্রমে দুর্গের মধ্যে খাবারের অনটন দেখা দিল। কেমন করে কি উপায়ে আহার সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তায় সকলে যখন ব্যাকুল তখন জিম এক অসসাহসিক কাজ করল। সে একা চুপি চুপি দুর্গ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গেল। কোন রকমে জাহাজে পৌঁছে সেখানকার ভাঁড়ার থেকে রসদ সংগ্রহ করে আনাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে জিম দেখল, তাদের পুরনো ডিঙিটা তোলা রয়েছে। সে অতিকষ্টে সেটা জলে নামিয়ে তার উপর চড়ে জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

জাহাজের উপর কোন সাড়া শব্দ নেই। সিলভারের লোকগুলো কোথায়? জিম জাহাজের পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে জাহাজের উপর উঠল।

কোথাও কেউ নেই? ওকি! অদূরে ডেকের উপর তিন চার জন লোক বেহুঁস হোয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল তারা সিল-ভারের দলের লোক। তাদের এ অবস্থা হল কেমন করে? জিম দেখল তাদের আশে পাশে কয়েকটা মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে।

জাহাজের ভাঁড়ারে মদের সন্ধান পেয়ে লোকগুলো বোতলের পর বোতল শেষ করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ আকাশ কালো করে জোর বাতাস বইতে শুরু করল। জিম তখন বুদ্ধি করে জাহাজের পাল তুলে দিয়ে জাহাজটাকে দ্বীপের এক ধারে নিয়ে গেল, তারপর জাহাজের নোঙর ফেলে জাহাজ থেকে নেমে সে দুর্গ অভিমুখে ছুটল।

জাহাজটাকে সে বেঁধেছিল দুর্গের কাছে, তাদের দলের নাগালের মধ্যে, নিরাপদ জায়গায়। অর্থাৎ তারা যদি দ্বীপ থেকে পালাতে চায় তো জাহাজটা আছে। কিন্তু ডাকাতগুলোর দ্বীপ থেকে পালাবার পথ নেই।

দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে তার কেমন যেন বোধ হল। চারদিক অন্ধকার। সাড়া শব্দ নেই। তার দলের লোকজন সব গেল কোথায়?

জিম একটু ইতঃস্তত করল তারপর সাহসে ভর করে ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে জিম বন্দী হল।

জিম ভীত হতভম্ব! এ তো সব সিলভারের অনুচর! তার দলের লোকজন কোথায় গেল? তারা কি-সবাই ডাকাতদের হাতে মারা পড়েছে?

সিলভারের কথায় জিম জানল, তারা সবাই স্বেচ্ছায় দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে।

ভয়ে জিমের বুক দুর দুর করছে। সিলভারের দলের সবাই বলছে এখনি জিমকে মেরে ফেলা হোক! কিন্তু সিলভার তাতে রাজী নয়। সে কঠিন কণ্ঠে হুকুম দিলে, জিমের গায়ে কেউ হাত তুলবে না। যদি কেউ তার হুকুম অমান্য করে তাহলে তাকে সিলভার সঙ্গে সঙ্গে বধ করবে।

এদিকে ডাকাতের দল অত্যন্ত দমে গিয়েছিল। একে তো তাদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়েছিল, বেশ কয়েকজন জখমও হোয়েছিল,

তার উপর খাবার দাবার নেই। অনেকেই গাছগাছড়া খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

তখন সকলে সর্দারের উপর খাপ্পা হল। আর কতদিন তারা এভাবে অনাহারে আর অসুস্থ অবস্থায় থাকবে? অবিলম্বে রত্নগুহার সন্ধান চাই।

॥ ছয় ॥

বহু খোঁজাখুঁজির পর সিলভারের দল রত্নগুহার সন্ধান পেল।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে তারা কি দেখল?

দেখল, রত্নগুহায় কোন ধনরত্ন নেই। তারা আসবার আগেই কে বা কারা সব কিছু সাফ করে নিয়ে গেছে! রত্নগুহার চিহ্নস্বরূপ এদিক ওদিক দু'একটা স্বর্ণমুদ্রা পড়ে রয়েছে মাত্র।

হতাশায় তারা ভেঙে পড়ল। তারপর দলপতির বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। তার জন্যেই তো তাদের এই কষ্ট, এই ব্যর্থতা, এই হতাশা! অতএব মেরে লোপাট করে দাও সর্দারকে!

সিলভার জিমকে বাঁচিয়েছিল, তাই তার প্রতি জিম অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। এখন তার বিপদ দেখে জিম স্থির থাকতে পারল না। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে বললে, খবরদার, কেউ যদি সর্দারকে মারতে চাও, তাকেও জ্যান্ত থাকতে হবে না।

জিমের সাহস দেখে ডাকাতগুলো থমকে গেল।

এমন সময় বনের মধ্যে বন্দুকের শব্দ হল, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম।

দুর্গের দরজার কাছেই শব্দ! কারা বুঝি দুর্গ আক্রমণ করেছে!

তখন ডাকাতরা ঝগড়া ভুলে সবাই এক জোট হয়ে দাঁড়াল। কারা এরা?

তাঁরা জাহাজের কাপ্তেন, ডাক্তার লিভ্‌সে আর জমিদার। সঙ্গে অনুচরবর্গ!

ইতিমধ্যে তাঁরা বেনগানের সাহায্যে রত্নগুহা খুঁজে বার করে ধনরত্ন সব সরিয়ে ফেলেছিলেন। এইবার সিলভারের দলকে ধ্বংস করবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে জিমকে উদ্ধার করাও ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

ডাকাতরা আর লড়াই করবার ভরসা পেল না। তারা সকলেই অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা আত্মসমর্পণ করল।

তাদের প্রাণে না মেরে সেই দ্বীপে ফেলে রেখে ডাক্তারের দল ধনরত্ন নিয়ে জাহাজে চড়ে দেশে ফিরলেন।

বহু বিপদের মধ্যে তাঁদের দিন কাটাতে হয়েছিল, অনেকগুলি অনুচর প্রাণ হারিয়েছিল, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা অসার্থক হয়নি। তাঁরা যা পেয়েছিলেন তার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা।

দলের যারা মারা গিয়েছিল তাদের পরিবারবর্গকে তাঁরা পর্যাপ্ত টাকা দিলেন এবং বাকী জীবন তাঁরা সকলেই অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে অতিবাহিত করলেন।

জিমও তাঁদের সঙ্গে সমান অংশ পেয়েছিল। সেই অঢেল টাকা নিয়ে জিম তার মায়ের কাছে ফিরে এলো এবং মা ও ছেলে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল।

কিং লীয়ার ঃ শেকসপীয়র

"আমি সারা পৃথিবী জয় করেছি"—এমন কথা ঘোষণা করবার মত মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র একজনই জন্মেছেন, তিনি উইলিয়াম শেক্সপীয়র। চারশো বছর আগে ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম। কিন্তু তিনি আজ আর কোন একটি দেশের বা বিশেষ কালের মানুষ নন, তিনি সকল দেশের, সকল কালের। এমন কোন দেশ নেই যেখানে তাঁর নাটক পড়া হয়না, এমন কোন মঞ্চ নেই যেখানে তাঁর নাটক অভিনীত হয়না। তিনি তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে সর্বকালের সকল মানুষের চিরকালের কাহিনী বলেছেন, সকল দেশের মানুষ তাঁর নাটকের জীবন-দর্শনের মধ্যে নিজেদের জীবনের প্রতিফলন দেখে বিস্মিত উদ্বোধিত হয়েছে।" **Every age, every man in his seven ages, will find a reflection in Shakespeare's universal mirror. The passion and the poetry echo in the corridors of the mind and will go on echoing to the last syllable of recorded time."**

সর্বকালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিশেষ করে বিয়োগান্ত নাটকেই তাঁর ঐশ্বরিক প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। সেই নাটকগুলির প্রত্যেকটির কাহিনীই চির-কালের কাহিনী। তাই শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে আমরা তাঁর কোন একটি কাহিনীতেই আবদ্ধ থাকব না, আমরা তাঁর বিয়োগান্ত নাটকগুলি, যথা 'কিং লীয়ার', ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট, জুলিয়াস সীজার, অ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রা, রোমিও জুলিয়েট এবং তৃতীয় রিচার্ড-এর কাহিনী পরিবেশন করব। এই নাটকগুলির কাহিনী এবং পাত্র পাত্রীদের চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে, মানবমনের অতলস্পর্শী রহস্য, নিয়তি ও ষড়রিপুর তাড়নায় মানুষের বিপর্যয় এবং সেই সঙ্গে মহত্তর জীবনের প্রতি মানুষের চিরকালের আকুল অভীপ্সা।

বিটেনের রাজা সারাজীবন সুখে রাজত্ব করে বৃদ্ধ হয়েছেন। দেশ শাসনের দায়িত্ব তিনি আর বহন করতে চান না। সব ঝামেলা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিরিবিলি বসে আরাম করাই তাঁর কামনা।

তাঁর পুত্র নেই, আছে তিনটি কন্যা—গনেরিল রিগান আর কর্ডেলিয়া। বড় কন্যা দুইটির বিবাহ বড় ঘরের যোগ্য পাত্রেই দিয়েছেন। বড় জামাই ডিউক অফ আলবানি মেজ ডিউক অফ কর্নওয়াল। ছোট মেয়েটির বিবাহ এখন দেননি, তবে তাঁকে বিবাহ করার আশায় ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউক দুজনেই ঘন ঘন এদেশে আসছেন। নাটকের শুরুতে তাঁরা দুজনেই লীয়ারের অতিথিরূপে উপস্থিত রয়েছেন।

লীয়ারের ইচ্ছা –সমস্ত রাজ্য তিন কন্যাকে ভাগ করে দিয়ে নিজে পালা করে তাদের গৃহে গিয়ে বাস করবেন।

এই পরিকল্পনা স্থির করে একদিন তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর তিন কন্যা, দুই জামাতা এবং ছোট মেয়েকে বিবাহ করবার জন্যে যাঁরা এসেছেন, সেই ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউককে। নিজের সভাসদ ও দেশের বড় লোকদেরও ডাকলেন তিনি।

দেশের মানচিত্র খুলে বসলেন লীয়ার। প্রথমে কাছে ডাকলেন গনেরিলকে, বললেন—"মা, তুমি আমার বড় মেয়ে, তোমার উপরই আমার আশা ভরসা বেশী। তোমার নিজের মুখে আমি শুনতে চাই –তুমি আমায় কতখানি ভালবাস। তোমার উত্তর শোনবার পরে স্থির করব যে রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ তোমায় দেওয়া উচিত।'

এগিয়ে এলেন গনেরিল। মেয়েটির বিষয়বুদ্ধি খুব ধারালো লীয়ারকে খুশি করে কিভাবে রাজ্যের ভালো ভালো জায়গাগুলি নিজের ভাগে টেনে আনা যাবে তা তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে। তিনি বলতে লাগলেন –"আমার ভালবাসা? পিতা, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যার সঙ্গে আপনার প্রতি আমার ভালবাসার তুলনা হতে পারে, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি জানিনা, চাই না, ভালবাসি না। আপনি আমার জীবনের আনন্দ, চোখের তারা! লবণহীন ব্যঞ্জন যেমন বিস্বাদ, আপনাকে কাছে না পেলে জীবনও আমার কাছে তেমনি বিস্বাদ হয়ে যাবে।"

চমৎকার। এই রকমই তো শোনবার প্রত্যাশা করেছিলেন লীয়ার! গনেরিল সত্যিই তাঁকে ভালবাসে! অতএব রাজ্যের সবচেয়ে ভাল অংশটি তারই পাওয়া উচিত। মানচিত্রের উপর দাগ দিয়ে তিনি মন্ত্রী, সেনাপতি, ডিউক যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল গনেরিলকে দিয়ে দিতে চান।

তারপর ডাক পড়ল রিগানের। চাতুরীতে তিনিও তাঁর বড় বোনের চেয়ে কম যান না। তিনি আরও চড়া পর্দায় তোষামোদ শুরু করলেন। বললেন -'পিতা! আমার ভালবাসার কথা আর নিজ মুখে কি বলব? দিদি যা বলেছেন—সে আর এমন কি ভালবাসা? তারও উপরকার ভালবাসা যদি কিছু থাকে—অবশ্যই তা আছে, তবে আপনার প্রতি আমার ভালবাসা সেইরকম। আপনাকে ছাড়া কোন আনন্দ আমার নেই, কোন আনন্দের কথা কল্পনাই করতে পারি না।'

লীয়ার যেন হাতে স্বর্গ পেলেন এমন সব কন্যা যার সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তিনি মানচিত্রে আর একটা অংশ রিগানের জন্য চিহ্নিত করে দিলেন।

তারপর তিনি ডাকলেন কর্ডেলিয়াকে। তাঁর ছোট মেয়ে। তিনটি মা-হারা মেয়ের মধ্যে তিনি ছোটটিকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁর মুখ থেকে যে আরও মধুর ভালবাসার কথা শুনতে পাওয়া যাবে, এতে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। তিনি তাঁকে সাদরে কাছে ডেকে বললেন "এইবার কর্ডেলিয়া তুমি কী বলতে চাও!"

কিন্তু কর্ডেলিয়া, তাঁর বরাত মন্দ রাজ্যের লোভে লজ্জা ভয় ভদ্রতা বিবেক সবকিছু বিসর্জ্জন দিতে পারেননি। স্বভাবতঃই তিনি তোষামোদের ঘৃণা করেন। তার উপর আজ এই বিশেষ ক্ষেত্রে— স্নেহময় পিতাকে ঠকাবার জন্য তোষামোদের কথা বলা— তাঁর কাছে

এর চেয়ে ঘৃণায় জিনিস আর কিছু হতে পারেনা। অবশ্য পিতাকে তিনি সত্যই ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে কি জেনে শুনে কতকগুলো মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে হবে? একাজ করলে তিনি কি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন না?

লীয়ার হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন—"তোমার কি বলবার আছে কন্যা।" অনেক কিছু গালভরা মিষ্টি কথা শোনবার প্রত্যাশা তাঁর, তা তাঁর গলার স্বর শুনেই বোঝা যায়।

কর্ডেলিয়ার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায়না, শেষে অনেক কষ্টে মাথা হেঁট করে বললেন "কিছুনা"!

—"কিছুনা।"

লীয়ারের মনে হল তিনি ভুল শুনেছেন। তিনি নিজে তিন মেয়ের ভিতর কর্ডেলিয়াকে ভালবাসেন বেশী। বিশ্বাসও করেন যে, তিন মেয়ের ভিতর কর্ডেলিয়াই সকলের সামনে বলছেন—"কিছুনা?" কিছু বলবার নেই? পিতাকে ভালবাসে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে কিছুই সে বলতে চায় না?

তবে কি কর্ডেলিয়াকে ভুল বুঝেছিলেন এতদিন! তিনি পুনরায় বললেন "ভেবে বল কর্ডেলিয়া। 'কিছু না" হয়ে যেতে পারে।

কর্ডেলিয়া কি লোভের বশে তোষামোদ করবেন? না, ভয় পেয়ে যা তা বলবেন? তিনি ধীর স্থির বিনীতভাবে বলতে লাগলেন—"বাবা! আপনি জন্মদাতা। পরম স্নেহে আমায় এতদিন লালন পালন করেছেন, আপনি সকল বিষয়ে সুশিক্ষা দিয়েছেন। সেজন্য যতটা কৃতজ্ঞতা আমার থাকা উচিত, তা ষোল আনাই আমার আছে। যতটুকু ভক্তি আপনার উপর থাকা উচিত, তার চেয়ে এক তিলও কম আমার নেই। এর চেয়ে বেশী আর কি বলব? দিদিরা অনেক কথা বলেছেন, সে সব কথা বলা আমি সংগত মনে করিনা। তাঁরা বলেছেন—আপনাকে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা ভালবাসেন না। তাই যদি হয়, তবে তাঁরা বিবাহ করলেন কেন? স্বামীকে দেবার জন্য

এতটুকু ভালবাসাও কি তাঁদের অন্তরে অবশিষ্ট নেই? তাই যদি না থাকে তাঁরা স্বামীর সঙ্গে একসাথে বাস করেন কেমন করে?"

লীয়ার রেগে উঠলেন। যুক্তি শোনবার জন্য তিনি বসেননি, বসেছেন তোষামোদ শুনতে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই তা হলে তোমার কথা? যেটুকু ভালবাসা কর্ত্তব্য, ওটুকুই তুমি ভালবাস তোমার পিতাকে? তার চেয়ে একটুও বেশী নয়? কর্ত্তব্যের তাগিদ ছাড়া হৃদয়ের দরদ নেই?"

কর্ডেলিয়ার আর বলবার কিছু নেই।

লীয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালেন। রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ কর্ডেলিয়াকে দেবার জন্যে আলাদা করে রেখেছিলেন, তার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ রেখা টানলেন একটা। দুদিকের দুটি ভাগ বড় দুই মেয়ের মধ্যে বেঁটে দিলেন। দেশের অর্দ্ধেক হল রিগানের।

রেগে চেঁচিয়ে তিনি সবাইকে শুনিয়ে বললেন—"কর্ডেলিয়াকে আমি দেবনা, বিবাহের সময় এক কানাকড়ি যৌতুকও দেব না ওকে।"

পুরোনো সভাসদদের ভিতর কেণ্ট-এর আর্ল এর প্রতিবাদ না করে পারলেন না। অতি বিচক্ষণ লোক এই কেণ্ট। রাজাকে তিনি ভাল-বাসেন, ভক্তিও করেন। কিন্তু দরকার হলে রাজার কাছে প্রতিবাদ জানাতেও তিনি ভয় পান না।

কেণ্ট স্পষ্ট বললেন "মহারাজ! আপনি ভাল করে বিবেচনা করুন। যেভাবে রাজ্য ভাগ করে দিতে চাইছেন, তা অনুচিত। নিজে যতদিন বেঁচে থাকবেন, ক্ষমতা নিজের হাতে রাখা উচিত। আর যদি রাজ্য মেয়েদের দান করতেই হয়, এভাবে ছোট রাজকুমারীকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নেই। আপনার প্রতি তাঁর ভক্তি নেই বলে যে ধারণা, তা একেবারেই ভুল। কর্ডেলিয়া অতি সুশীলা, মনের ভাব পিটিয়ে প্রচার করতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন। তা নইলে তিনি যে মনে প্রাণে আপনাকে ভক্তি করেন, অতি গভীরভাবে ভালবাসেন, এ আমরা সকলেই বুঝি।"

লীয়ার ভীষণ বিরক্ত হলেন কেন্ট এর উপর। রাজার কথার উপর কথা? তিনি আদেশ করলেন—"তুমি চুপ কর আর্ল। আমি যা ব্যবস্থা করেছি, তা আর নড়চড় হবে না। কর্ডেলিয়াকে আমি ত্যাগ করেছি।"

"আপনি অন্যায় করেছেন"—জোর গলায় বলে উঠলেন কেন্ট—"এখনও এ অন্যায় আদেশ বাতিল করুন।"

"তুমি যদি চুপ না কর আমি তোমায় নির্বাসিত করব।"

"নির্বাসনের ভয়ে সত্য ও সংগত কথা বলতে ভীত হব না। কিসে আপনার সত্যকার ভাল হবে, আপনি তা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। সোনা ফেলে কাচের আদর করছেন। আপনার চোখে আঙ্গুল দিয়ে আপনার ভুল যদি না দেখিয়ে দিই, তবে বৃথাই এতদিন আপনার নিমক খেয়েছি।"

লীয়ার আর সহ্য করতে পারলেন না। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে হুকুম দিলেন—কেন্টকে এক্ষুনি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হবে।

মাত্র একটি লোকের সত্যিকার দরদ ছিল রাজার উপরে। তিনিও নির্বাসনে চলে গেলেন।

তখন রাজা কাছে ডাকলেন বার্গাণ্ডির ডিউক ও ফ্রান্সের রাজাকে—"আপনারা দুজনেই ঐ কর্ডেলিয়াকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। দেখছেন তো, আমি ওকে ত্যাগ করেছি, ওর বিবাহে কিছুমাত্র যৌতুক দিতে আমি রাজী নই। এ অবস্থায় আপনাদের ভিতর কেউ কি ওকে বিবাহ করতে রাজী আছেন এখন?"

বার্গাণ্ডির ডিউক বললেন "আপনার মৃত্যুর পর রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ ছোট রাজকন্যা পাবেন এই আশাতেই আমি ওঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম। তা যদি না দেন- তবে আমার পক্ষে এ বিবাহ করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব"—ফ্রান্সের মহানুভব রাজা এগিয়ে এসে বললেন—"আমার পক্ষে তা খুবই সম্ভব। আমার নিজের রাজ্য

আছে, ছোট্ট ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ না পেলেও আমার চলবে। আমি চাই একটি সুশীলা পত্নী। কর্ডেলিয়ার অন্তর যে কত মহৎ, তা আমি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, তাঁর মত সুশীলাকে পত্নীরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে ভাগ্যকে মুঠোর ভিতর পেয়ে আমি ছেড়ে দেব না। চল কর্ডেলিয়া আমি তোমাকে ফ্রান্সে নিয়ে যাই। সেই খানেই হবে আমাদের বিবাহ।"

লীয়ার বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন, সঙ্গে গেলেন সভাসদ পারিষদ সবাই। শুধু মাত্র তিন ভগ্নী রইলেন সেখানে · গনেরিল, রিগান, কর্ডেলিয়া। আর রইলেন ফ্রান্সের রাজা।

'তোমার ভগ্নীদের কাছে বিদায় নাও কর্ডেলিয়া'—রাজা বললেন তাঁর ভাবী পত্নীকে

কর্ডেলিয়া চোখের জল ফেলে বোনেদের কাছে অনুনয় করলেন— "পিতাকে ফাঁকি যা দেবার, তা দিয়েছ। এখন শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি—তাঁর কোন অযত্ন তোমরা কোর না।"

রেগে তাঁরা বললেন—"তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না, পিতার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য আমরা জানি। তুমি যাও তোমার ভাবী স্বামীর প্রতি তোমার কর্তব্য ঠিকমত করো গিয়ে।"

গনেরিল আর রিগান তাঁদের নিজের নিজের রাজ্যে চলে গেলেন।

লীয়ার বন্দোবস্ত করেছেন—পালা করে একমাস গনেরিলের বাড়ীতে থাকলেন, একমাস রিগানের বাড়ী, নিজের বলতে তিনি শুধু রেখেছেন 'রাজা' উপাধি আর একশো নাইট। সেকালের ইউরোপীয় বীরদের সাধারণ নাম ছিল 'নাইট।' রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তাঁরাই ছিলেন রাজাদের প্রধান সহায়। এখন লীয়ারের রাজ্য নেই, কাজেই তাঁরাও রাজার মতই বেকার।

ঠিক হয়েছে—রাজার সঙ্গে সঙ্গে এই একশো নাইটও একমাস গনেরিলের বাড়ীতে, একমাস রিগানের বাড়ীতে বাস করবেন।

প্রথম মাস গনেরিলের বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা। দু'চারদিন সেখানে রাজার বেশ ভাল ভাবেই কাটল। তারপরই গনেরিল ক্রমশঃ নিজমূর্ত্তি ধারণ করতে লাগলেন। কোন দিনই তাঁর এমন মতলব ছিল না যে বুড়ো রাজাকে চিরকাল ঠাকুর দেবতার মত মাথায় করে রাখবেন, বা তাঁর সঙ্গের ঐ একশোটা নাইটের রাক্ষুসে খরচা বছরে ছ মাস ধরে বহন করবেন। তিনি নিজের ভৃত্যদের টিপে দিলেন ঐ নাইটগুলোকে যাতে তারা বিশেষ খাতির না দেখায়। তারা বিদায় হলেই যে এই বাড়ীর লোকেরা বাঁচে এটা যেন তাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেওয়া হয়।

ইঙ্গিত পেয়ে ভৃত্যরা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। লীয়ারের একটি প্রিয় বিদূষক ছিল। সে যেমন রসিক তেমনি জ্ঞানী। এই বিদূষকটিকে তারা অপমান করল।

রাজা এতে দারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। অপরাধী ভৃত্যটিকে প্রহার করলেন নিজের হাতে। আগুন জ্বলে উঠল। গনেরিল তাঁর সর্দার ভৃত্য অসওয়াল্ডকে হুকুম দিলেন বুড়ো রাজার খাতির রেখে আর তোমাদের চলবার দরকার নেই।

সেদিন রাজার সম্মুখে এল এক পৌঢ় ব্যক্তি,—সে একটা চাকরী চায়। নাম তার কেইয়াস। সে আর কেউ নয় ছদ্মবেশী কেন্টের আর্ল। প্রভুকে তিনি এতই ভালবাসেন যে তাঁকে ছেড়ে বিদেশে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। কন্যাদের আশ্রয়ে রাজার দিন যে সুখে কাটবে না, এ তিনি আগে থাকতেই অনুমান করেছিলেন। বুড়ো বয়সে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে রাজা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখন রাজাকে যদি দুঃখে পড়তে হয়, তবে তাঁর সেবা করবার জন্য কেন্টকে যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে। তাই নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি গরীবের বেশে লীয়ারের কাছেই ফিরে এসেছেন।

কেইয়াসের সঙ্গে লীয়ার কথা কইছেন, এমন সময় অস্‌ওয়াল্ড

এসে নানারকম অসভ্যতা করতে লাগল। রাজার প্রতি সামান্য ভৃত্যের এই অশিষ্ট আচরণ কেন্ট সহ্য করতে পারলেন না। পদাঘাত করে তাঁকে দূর করে দিলেন।

এতে প্রীত হয়ে রাজা বললেন—"তুমি" থাক কেইয়াস, আমার কাছেই থাক, আমার কাজ কর।"

এদিকে অস্‌ওয়াল্ড গিয়ে অভিযোগ করল গনেরিলের কাছে—রাজার এক নাইট আমাকে লাথি মেরেছে। গনেরিল এতক্ষণ অসুখের ভান করে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হননি। এইবার অজুহাত পেয়ে তিনি একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া করবার জন্য লীয়ারের ঘরে এসে হানা দিলেন।

"এসব কী অত্যাচার বাবা?" তিনি অভিযোগ করলেন—"তোমার দুর্দান্ত নাইটগুলোর জন্য আমার একতিল শান্তি নেই। তারা হৈ হল্লা করছে, মদ খাচ্ছে, নানারকম অসভ্যতা করছে, আমার রাজপ্রাসাদ যেন একটা সস্তাদামের হোটেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত অত্যাচার আমি সইতে পারব না।"

লীয়ার আকাশ থেকে পড়লেন - "আমার নাইটরা হৈ-হল্লা করছে? তারা তো সব সুসভ্য, বড় বড় বংশের সন্তান। তোমাব এ অভিযোগ একেবারেই বাজে।" তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন গনেরিলের সব কথা।

কিন্তু গনেরিল মনস্থির করেই এসেছেন। তিনি স্পষ্ট বললেন—" আমার প্রাসাদে একশো নাইটের স্থান হবে না বাবা! তুমি পঞ্চাশজন রেখে বাকীদের বিদায় করে দাও।"

এরকম কথা শোনার অভ্যাস নেই লীয়ারের। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠলেন -"অকৃতজ্ঞ! রাজ্য ভাগ করে দেওয়ার সময় কী বন্দোবস্ত হয়েছিল? একশো নাইট আমার সঙ্গে থাকবে এই কথা প্রথম থেকেই ছিল না? তোরা দুই বোন কি প্রথমেই এতে রাজী হোসনি? তোকে আর রিগানকে আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা সব

কিছুই দান করে দিয়েছি, আমার বলতে রেখেছি কেবল ঐ একশোটি নাইট। তারাও তোর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল? গোটা রাজ্যটার বিনিময়ে তাদের সামান্য ব্যয়ও তুই বহন করতে ইচ্ছুক নোস্?

রাজা যতই তিরস্কার করুন, গনেরিলের ঐ এক কথা, পঞ্চাশজন নাইটকে এখুনি বিদায় দিতে হবে। তাদের জায়গা গনরিলের প্রাসাদে হবে না।

ক্রুদ্ধ লীয়ার তাঁকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন তাঁর প্রাসাদ থেকে। তিনি আর তাঁর বাড়িতে থাকবেন না। আরও এক কন্যা আছে তাঁর! সে কখনও এমন নিমকহারাম হবে না, সে কখনও পিতার অসম্মান করতে পারবে না। তিনি রিগানের বাড়িতেই যাবেন ---এই দণ্ডেই যাবেন। কেইয়াস-বেশী কেন্টকে তিনি রিগানের কাছে পাঠালেন পত্র দিয়ে। পত্রে লিখলেন—আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এক্ষণই যাত্রা করছি।

কেণ্ট রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে গনেরিলও তাড়াতাড়ি রিগানকে এক চিঠি দিলেন। এখানে পিতার সঙ্গে যে কলহ হয়েছে তা সবিস্তারে লিখে তিনি রিগান-কে মতলব দিলেন যেন তিনিও বুড়ো বাপের আবদার না শোনেন। দু'জায়গায় একই ভাবে ঘা খেলে তবেই তিনি নিজের জেদ ছাড়তে বাধ্য হবেন।

কেণ্ট উপস্থিত হলেন রিগানের প্রাসাদে। ঠিক সেই সময় অস-ওয়াল্ডও হাজির হল গনেরিলের চিঠি নিয়ে। দুটি পত্রই পড়লেন রিগান। পত্র পড়েই তিনি স্বামী কর্নোওয়ালকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে তাঁর সমস্ত চাকর বাকররাও চলল। রাজা যদি আসেন, এসে দেখবেন যে প্রাসাদের দরজা বন্ধ।

কেণ্ট তাই দেখে রিগানকে বললেন - "আমার পত্রের উত্তর দিয়ে গেলেন না তো?"

রিগান বললেন —"আমরা গ্লস্টারের আর্লের বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে উত্তর দেব।"

অগত্যা কেন্ট গেলেন তাঁদের সঙ্গে। অসওয়াল্ডও গেল।

গ্লস্টার নিজে বৃদ্ধ হয়েছেন। লীয়ারের প্রতি তিনি বিশেষ ভক্তি-মান। সেইদিনই তাঁর বাড়ীতে এক বিষম কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। পালিত পুত্র এডমণ্ডের মিথ্যা অভিযোগে নিজপুত্র এডগারকে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এডগার কিন্তু সত্যিই কোন দোষ করেনি। সে যখন শুনল যে তার পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে খুঁজছেন তখন সে বনের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করল।

সেই ডামাডলের মধ্যে আর্ল রিগান ও তাঁর স্বামীর আদর আপ্যায়নে মন দিলেন। সেই সময় বাইরে কেন্টএর সঙ্গে অসওয়াল্ডের লড়াই বেধে গেল কর্নওয়াল কেন্টকে কাঠের পিপার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবার আদেশ দিলেন।

এদিকে লীয়ার এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে রিগান আর কর্নোয়াল বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে রইলেন। লীয়ারকে জানানো হল, তার কন্যা জামাতা বড়ই অসুস্থ, এখন তাঁরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

লীয়ার স্তম্ভিত। এই কি রিগানের ভক্তি আর ভদ্রতা? তিনি যে বড় আশা করে ছুটে এসেছিলেন। তারপর তাঁর দূত কেন্টএর অবস্থা দেখে তিনি রেগে আগুন হলেন। বারবার তিনি চীৎকার করে মেয়েকে ডাকতে লাগলেন। তখন অগত্যা রিগান আর কর্নোয়ালকে বেরিয়ে আসতে হল। কেন্টকেও মুক্ত করে দেওয়া হল।

কিন্তু রিগানের মুখে একী কথা শুনলেন লীয়ার। রিগান স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে তিনি লীয়ারকে আশ্রয় দিতে পারবেন না।

চিঠি লিখে ভগ্নীকে উসকে দিয়েও গনেরিল স্থির থাকতে পারেন নি। তিনিও রিগানের বাড়ি হাজির হলেন। ভগ্নীকে বললেন, একশো

জন নাইট সমেত রাজাকে স্থান দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। রিগান যদি পারে তো সেই ব্যবস্থা করুক।

রিগান বললেন—তিনি একশোজন বা পঞ্চাশ জন নাইট রাখতে পারবেন না তাঁর কাছে থাকতে হলে রাজাকে মাত্র পঁচিশজন নাইট নিয়ে থাকতে হবে।

রাজা তখন পাগলের মতো বললেন—"তবে চল, গনেরিল, তোর কাছেই ফিরে যাই। তুই তো পঞ্চাশ জন নাইটকে ঠাঁই দিবি বলেছিলি।"

কিন্তু এবার গনেরিল সুযোগ বুঝে রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, রাজার এখন এত নাইটের দরকার কি? নাইট-গুলোকে বিদায় করে দিয়ে রাজা যদি একলা থাকতে চান তো তিনি তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

তখন আকাশের কালো ঝড় আসছে। লীয়ার দুই কন্যার মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখলেন। এরা কি তাঁর দুই কন্যা? না, নরকের কীট? মানুষ কখনো এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে? এমন পিশাচের মতো নিষ্ঠুর হোতে পারে? এরা তাঁর সন্তান, না এরা মানুষের বেশে দানবী? ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন লীয়ার—"আমি তোমাদের কারুর কাছেই আশ্রয় চাই না। তোমাদের বাড়িতে বাস করার চেয়ে এই ঝড়ের রাতে খোলা মাঠে পড়ে থাকাও শ্রেয়। তোমরা নরকে যাও। তোমাদের মুখ আর দেখবো না।"

এই বলে তিনি পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

সে কী ভীষণ রাত্রি। ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাতে পৃথিবী যেন ধ্বংস হবে আজ। মাটি থরথর করে কেঁপে উঠছে। মেঘ ডাকছে আকাশ বিদীর্ণ করে। তারই নীচে শুভ্র কেশ এলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ লীয়ার খোলা মাঠে এসে দাঁড়িয়েছেন, চীৎকার করে অভিসম্পাত দিচ্ছেন কন্যাদের, আকাশকে ডেকে বলছেন—"পৃথিবীটাকে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও।" বজ্র বিদ্যুতকে তিরস্কার করে বললেন—"আমি তোমাদের কি অনিষ্ট

করেছি যে শয়তানী দুটো মেয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে তোমরা এই বুড়োর মাথার উপর এত অত্যাচার বর্ষণ করে চলেছো।"

এমন সময় কেন্ট এসে তাঁকে একটা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেলেন : সেখানে থাকে পাগলা টম রূপে ছদ্মবেশী এডগার, গ্লস্টারের পলাতক পুত্র।

একটু পরেই বৃদ্ধ গ্লস্টার এলেন মশাল নিয়ে, তিনি রাজাকে কুটির থেকে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী এক গোয়াল বাড়িতে তুললেন। আহার্য এনে দিলেন। শয্যা নিয়ে এলেন। রাজাকে সত্যিই ভক্তি করতেন গ্লস্টার। তাই কর্নোয়ালের নিষেধ সত্বেও তিনি রাজার কাছে ছুটে এসেছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই রাজভক্তির ফল হল অতি ভয়ানক। তাঁর পালিত পুত্র নরাধম এডওয়ার্ড, কর্নোয়ালকে বলে দিল যে গ্লস্টার তাঁর কথা অমান্য করে রাজার কাছে গিছলেন। এই কথা শুনে রাগে ফেটে পড়ে কর্নোয়াল। বৃদ্ধ গ্লস্টার ফিরে আসতেই তাঁর চোখ দুটো উপড়ে নিলেন।

গ্লস্টারের এক ভৃত্য প্রভুকে বাঁচাতে গিয়ে কর্নোয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা পড়ল বটে কিন্তু তার অস্ত্রের আঘাতে কর্নওয়ালও সাংঘাতিক আহত হয়ে, বিযাক্ত ক্ষতের যন্ত্রণায় মারা পড়লেন।

স্বামীকে হারিয়ে রিগান কিন্তু কোন দুঃখ বোধ করলেন না। তিনি পাপিষ্ঠ এডমণ্ডকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন এবং তাকে নিজের রাজ্যের শাসক পদে নিযুক্ত করলেন।

এদিকে কেণ্ট কিছু লোকজন সংগ্রহ করে লীয়ারকে ডোভারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্র পার হয়ে ফ্রান্সের একটা সৈন্যদল সেখানে অবতরণ করেছে। কর্ডেলিয়া সেই সৈন্যদল নিয়ে নিরাশ্রয় পিতাকে রক্ষা করতে এসেছেন।

লীয়ার তখন বদ্ধ পাগল। কর্ডেলিয়াকে তিনি চিনতেই পারলেন না।

ফ্রান্সের সৈন্য এসেছে শুনে গনেরিলের স্বামী আলবানি এবং রিগানের ভাবী স্বামী এডমণ্ড একত্রে সেই আক্রমন প্রতিরোধ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। ধর্মের জয় এ পৃথিবীতে সব সময় হয় না। যুদ্ধে গনেরিল রিগানেরই জয় হল। লীয়ার ও কর্ডেলিয়া বন্দী হলেন। এতক্ষণে লীয়ার কর্ডেলিয়াকে চিনতে পারলেন। বললেন, "চল্ মা, খাঁচার পাখির মতো দুজনে কারাগারে বসে গান গাই।"

কিন্তু সে সুযোগ তাঁদের হল না। দুর্বৃত্ত এডমণ্ডের আদেশে কর্ডেলিয়া নিহত হলেন। আর কন্যার মৃতদেহ-কোলে নিয়ে হাহাকার করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন ভাগ্যহীন রাজা লীয়ার। মরবার আগে তিনি বুঝে গেলেন, তিন মেয়ের মধ্যে কে তাঁকে সবচেয়ে বেশী সত্যিকারের ভালবাসতো।

তারপর গনেরিল চক্রান্ত করে রিগানকে বিষ খাইয়ে মারলেন এবং নিজেও স্বামী আলবানির ভয়ে আত্মহত্যা করলেন।

এডমণ্ডও রেহাই পেল না। এডগারের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে মারা পড়ল।

মৃত রাজা লীয়ারের জন্য শোক করতে বেঁচে রইলেন কেণ্ট। অন্ধ গ্লস্টারের পরিচর্যা করবার জন্য রইল পিতৃভক্ত পুত্র এডগার। আর রাজ্যশাসন করবার জন্য রইলেন নতুন রাজা আলবানি। তিনি কোনদিন গনেরিল রিগানের পাপ কার্যকে সমর্থন করেন নি।

ম্যাকবেথ : শেকসপীয়র

স্কটল্যাণ্ডের রাজা পরম ধার্মিক দয়ালু বৃদ্ধ ডানকান। তাঁর এক জমিদার কডোরের থেন বিদ্রোহ করল। সেই বিদ্রোহ দমন করে রাজার দুই সেনাপতি ম্যাকবেথর ও ব্যাংকো রাজপ্রাসাদে ফিরছেন। ইতিমধ্যে ডানকান সেই বিজয় সংবাদ শুনে এবং ম্যাকবেথের অসীম বীরত্বের কাহিনী অবগত হয়ে আনন্দিত হয়ে ঘোষণা করেছেন, কডোরের থেনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক এবা তার জমিদারি ম্যাকবেথকে দিয়ে তাঁকে করা হোক নতুন 'থেন অফ কডোর।'

একটা পাহাড় ঘেরা জলা। জলায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আর তার মধ্যে তিনটে ছায়ামূর্তি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অদ্ভুত তাদের আকৃতি। নারীর মতো দেহ। কিন্তু তাদের মুখে দাড়ি। দেখলে মনে হয় না এজগতের মানুষ। ঘুরে ঘুরে তারা নৃত্য করছে আর নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় ছড়া কাটছে।

সেই জলার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবার সময় ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো সেই তিনটে ডাইনীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পর ম্যাকবেথ উচ্চকণ্ঠে তাদের প্রশ্ন করলেন—কে তোমরা? কথা কইতে পারো তো উত্তর দাও।

প্রথম ডাইনী বললে—জয় হোক ম্যাকবেথ। তুমি গ্লামিসের থেন, তোমার জয় হোক।

গ্লামিস নামক জমিদারির থেন অর্থাৎ অধিশ্বর ছিলেন ম্যাকবেথ। তাই বোধ করি তারা তাঁকে গ্লামিসের থেন বলে সম্বোধন করল।

দ্বিতীয় ডাইনী এবার বলে উঠল জয় হোক ম্যাকবেথ। তুমি কডোরের থেন। তোমার জয় হোক।

সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ডাইনী বলে উঠল—জয় হোক ম্যাকবেথ। তুমি হবে স্কটল্যাণ্ডের রাজা? এসব তো তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেন নি!

এবার ব্যাংকো বললেন—সত্যি করে বল, তোমরা কি দেহধারী প্রাণী, না হাওয়া মাত্র, আমার বন্ধুকে তোমরা অনেক ভাল ভাল কথা বললে, কিন্তু আমায় তো কিছু বললে না! আমায় কি কিছুই বলবার নেই তোমাদের?

তখন প্রথম ডাইনী বললে—জয় হোক ব্যাংকো, তুমি ম্যাকবেথের মত বড় হবে না—আবার একদিক দিয়ে ম্যাকবেথের চাইতেও বড় হবে।

দ্বিতীয় জন বললে -জয় হোক ব্যাংকো, একদিক দিয়ে ম্যাক-বেথের চাইতে অনেক বেশী সুখী হবে তুমি।

তৃতীয় ডাইনী যোগ করলে—তুমি নিজে রাজা হবে না। কিন্তু তোমার বংশের লোক এদেশের রাজা হবে।

বলতে বলতে তারা সেই কুয়াশায় মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো দুজনের চিত্তই আলোড়িত। এ কী অদ্ভুত দৃশ্য তাঁরা দেখলেন, কী সব বিচিত্র দ্বর্থ্যবোধক কথা শুনলেন।

ম্যাকবেথ গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি গ্লামিসের থেন বটে, কিন্তু কডোরের থেন কেমন করে হবেন, কডোরের থেন তো জীবিত! আর স্কটল্যাণ্ডের রাজা? তাই বা কী করে সম্ভব।

ব্যাংকো বললেন,—অদ্ভুত ব্যাপার! তাই না? কী ভাবছ।

ম্যাকবেথ বললেন,—ডাইনীদের কথা, তোমার বংশধরেরা রাজা হবে।

ব্যাংকো ম্যাকবেথের মনের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলেন। পরি-হাসের সুরে বললেন - আর তুমি যে নিজেই রাজা হবে!

হঠাৎ অদূরে কয়েকজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল, তারা রাজসভার লোক, রাজা ডানকান তাদের পাঠিয়েছেন, রণজয়ী সেনাপতি দুজনকে

আগ বাড়িয়ে সম্বর্ধনা জানিয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। তারা জানালো, রাজা আদেশ দিয়েছেন, কডোরের থেনকে বধ করা হবে এবং তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে তা ম্যাকবেথকে দেওয়া হবে। ম্যাকবেথ হবেন কডোরের থেন।

শুনে যেন বিহ্বল হলেন ম্যাকবেথ। ডাইনীদের মধ্যে দ্বিতীয় জনের কথা মিলে গেল। তাহলে বাকি কথাটাও কি সত্য হবে? তিনি সত্যিই স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবেন?

ম্যাকবেথের মন উচ্চাশার দোলায় দুলতে লাগল।

॥ দুই ॥

ম্যাকবেথের গ্লামিস দুর্গে তাঁর সঙ্গে বাস করেন তাঁর স্ত্রী লেডী ম্যাকবেথ।

ম্যাকবেথ রাজধানীতে পৌঁছে তাঁর স্ত্রীকে পত্র দিয়ে ডাইনীদের সব কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন, পত্র পড়ে লেডী ম্যাকবেথ দারুণ উত্তেজিত হয়েছেন। লেডী ম্যাকবেথ ছিলেন এক অতি লোভী এবং উচ্চাভিলাষিণী রমণী। স্বামীর বাহুবল এবং নিজের মনোবলের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। চেষ্টা করলে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয় বলে তিনি মনে করলেন। ডাইনীদের ভবিষ্যৎবাণী তাঁকে সফল করতেই হবে। তিনি জানেন, তাঁর স্বামীর মন দুর্বল। তাঁকে উত্তেজিত করতে হবে, সাহস আর উৎসাহ জোগাতে হবে। লেডী ম্যাকবেথ নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন।

এমন সময় দূত এসে জানালো, রাজা ডানকান আজ এই দুর্গে আসছেন। ম্যাকবেথের উপর তাঁর স্নেহ যে কত গভীর তা প্রমাণ করবার জন্যেই তিনি আজ রাত্রে এখানে এসে অতিথি হবেন।

সংবাদ শুনে লেডী ম্যাকবেথের বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। এ কী নিয়তির ইসারা। নিজেকে সংযত করে তিনি দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন —তোমার প্রভু কোথায় সেনাপতি ম্যাকবেথ ?

তিনি এখনি আসবেন। বলে দূত চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাকবেথ এলেন। লেডী ম্যাকবেথ তাঁকে প্রশ্ন করলেন - রাজা আসছেন কখন ?

—আজ সন্ধ্যায়, উত্তর দিলেন ম্যাকবেথ।

—ফিরতে চান কবে ?

—রাত্রি শেষেই।

লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন তাহলে এ রাত্রি তাঁর শেষ হবে না।

চমকে উঠলেন ম্যাকবেথ—এ কী কথা বলছ তুমি ?

নিজের মনে যে চিন্তা এক একবার বিদ্যুত চমকের মত হানা দিয়ে যাচ্ছে, স্ত্রীর মুখে সেই কথা উচ্চারিত হতে শুনে ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি।

॥ তিন ॥

রাজা এলেন, সঙ্গে সেনাপতি ব্যাংকো, সেনানায়ক ম্যাকডাফ, রাজপুত্রদ্বয় ম্যালকম ও ডোনালবেন এবং উচ্চপদস্থ পারিষদবর্গ, সবাই আজ ম্যাকবেথের অতিথি। সবাই সম্মান জানাতে এসেছেন যুদ্ধজয়ী বীর সেনাপতিকে।

মহাভোজের আয়োজন করেছেন ম্যাকবেথ, অতিথিরা সবাই আহারে বসলেন। কিন্তু ম্যাকবেথ তাঁদের সঙ্গে বসতে পারছেন না। লেডী ম্যাকবেথ তাঁর কানে যে মন্ত্র শুনিয়েছেন তা তাঁর চিত্তকে তোলপাড় করে তুলেছে। দুটো শক্তি দুদিকে টানছে তাঁর মনকে। উচ্চাশা বলছে -এ সুযোগ হারিও না। রাজমুকুট আজ তোমার

হাতের মুঠোয়। ডাইনীরা তো বলেছে তুমি রাজা হবে। সুতরাং সাহস করে হাত বাড়াও। বুড়ো রাজার মাথা থেকে মুকুট তুলে নিজের মাথার পর। এ সুযোগ হারিও না।

কিন্তু বিবেক প্রতিবাদ জানাচ্ছে—ধিক্ তোমার চিন্তাকে। তোমার রাজা, তোমার অতিথি, ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ তোমায় ভালবেসে যেচে তোমার ঘরে এসেছেন। তাঁকে তুমি হত্যা করবে? এ পাপ কি সয়? এমন কাজ করো না ম্যাকবেথ।

অন্তরের এই দোটানায় অস্থির হয়ে ভোজসভা থেকে পালিয়ে এলেন ম্যাকবেথ। সঙ্গে সঙ্গে লেডী ম্যাকবেথ এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি স্বামীর দুর্বলতা ধরে ফেলেছেন। কঠোর তিরস্কার করে বললেন—কেমনধারা পুরুষ তুমি, অন্তরে যা চাও তা পাবার চেষ্টা করতে ভয় পাও?

স্খলিত স্বরে ম্যাকবেথ বললেন—ভয় নয়। কিন্তু লোকে আমাকে ভালবাসে, সম্মান করে, একাজ যদি আমি করি আর তা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তা কি কলঙ্কের ব্যাপার হবে বল দেখি।

গর্জে উঠলেন লেডী ম্যাকবেথ—কলঙ্কের ভয়। তুমি পুরুষ, বীর তুমি, নিয়তিকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তুমি। তুচ্ছ কলঙ্কের ভয়ে তুমি ভীত। বেশ, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি নিজের হাতে এ কাজ করব।

। চার ।।

গভীর রাত্রি, রাজকর্মচারী, পারিষদবর্গ সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ দুর্গের ভিতরে, কেউ বা দুর্গ সংলগ্ন ভবনে।

সবাই ঘুমুচ্ছে। এমন কি রাজার শয়নকক্ষের দরজায় যে দু'জন প্রহরী আছে তারা পর্যন্ত। তাদের জেগে পাহারা দেবার কথা।

কিন্তু লেডী ম্যাকবেথ তাদের পানীয়ের মধ্যে এমন কিছু ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন, যা খেয়ে তারা ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

ম্যাকবেথকে পাশের ঘরে রেখে লেডী ম্যাকবেথ রাজার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে ছুরিকা। দু'চোখে খুনের নেশা!

ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এলেন লেডী ম্যাকবেথ। তাঁর সারা দেহ কাঁপছে। স্বামীকে বললেন, – পারলাম না। ছুরি তুলেছিলাম তাঁর বুকে বসিয়ে দেবার জন্যে, কিন্তু হঠাৎ কেমন মনে হল, রাজার মুখটা যেন আমার স্বর্গগত বাবার মুখের মত, আমার হাত কেঁপে গেল, বুকও কেঁপে উঠল। ছুরি আর তুলতে পারলাম না।

ম্যাকবেথ তখন এগিয়ে গেলেন। মন থেকে ভয় দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছেন তিনি। সামনে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ছোরা যেন হাওয়ায় দুলছে! সেই ছোরাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ম্যাকবেথ প্রবেশ করলেন রাজার ঘরে।

একটু পরেই ফিরে এলেন। হ্যাঁ, তিনি কাজ সমাধা করে এসেছেন। তাঁর হাতের ছুরিতে রক্ত। তাঁর দু'চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন স্ত্রীকে একটা চিৎকার শুনছি না? একটা চিৎকার।

লেডী ম্যাকবেথ সবিস্ময়ে বললেন—চিৎকার! কোথায়? কই না তো! ওটা বোধহয় প্যাঁচার ডাক!

ঘাড় নেড়ে ম্যাকবেথ বললেন কিন্তু আমি স্পষ্ট চিৎকার শুনেছি। কে যেন বলে উঠল—আর ঘুমিও না, জাগো। গ্লামিস ঘুমকে হত্যা করেছে। সে আর ঘুমুবে না। কডোর আর ঘুমুবে না। ম্যাকবেথও আর ঘুমুবে না!

লেডী ম্যাকবেথ ধমক দিয়ে উঠলেন—ও তোমার মনের ভুল। রক্তমাখা ছুরিটা নিয়ে এসেছো কেন? ওটা তো প্রহরীদের হাতে গুঁজে রেখে আসার কথা, যাও রেখে এসো।

কিন্তু অসমসাহসী ম্যাকবেথের সে সাহস আর নেই। আবার

সেই বিভীষিকার ভিতর যাওয়া, না। তিনি পারবেন না। তখন লেডী ম্যাকবেথ নিজেই গিয়ে ছোরাটা রেখে এলেন নিদ্রিত প্রহরীদের হাতে।

॥ পাঁচ ॥

রাত্রিশেষে পাশের ভবন থেকে ম্যাকডাফ এসে দুর্গের দ্বারে করাঘাত করতে লাগলেন। রাজার নিজস্ব কাজগুলি তিনি করেন। রাজার আদেশ ছিল সূর্য ওঠবার আগেই ম্যাকডাফ এসে রাজাকে জাগাবেন।

দুর্গদ্বারের প্রহরী দরজা খুলে দিল। ম্যাকডাফ সোজা ওপরে ওঠে রাজার ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি। উচ্চকণ্ঠে হাহাকার করতে লাগলেন।

তাঁর সেই প্রবলকণ্ঠের বিলাপ শুনে দুর্গের সবাই জেগে উঠল। ব্যাপার কি?

রাজা খুন হয়েছেন! রাজা নিহত? শুনে সবাই যেন ভয়ে ঘৃণায় পাথর হয়ে গেল।

ম্যাকবেথ যেন ঘুম থেকে জেগেই ছুটে এলেন। রাজার ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এসে তিনি কপালে করাঘাত করে বলতে লাগলেন – এ কী হল! আমার বাড়িতেই রাজা খুন হলেন! অমন দয়ালু প্রভু আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে এসে প্রাণ হারালেন! এর চেয়ে যে আমার মরণ ছিল ভাল।

লেডী ম্যাকবেথ এলেন। খবর শুনে তিনি মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন! তাঁকে সবাই পাশের ঘরে রেখে এল।

তারপর প্রশ্ন উঠল— কে এ কাজ করলে?

প্রহরী দু'জন তখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের পাশে

রয়েছে রক্তমাখা ছোরা। ম্যাকবেথ বললেন· নিশ্চয়ই এরা হত্যা করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। নিজের তলোয়ার টেনে নিয়ে ছুটে গিয়ে প্রহরী দুটোকে নির্মমভাবে বধ করলেন। পাছে চৈতন্য ফিরে আসার পর তারা ম্যাকবেথের সম্বন্ধে কিছু বলে, তাই তার পথ আগে থেকেই বন্ধ করলেন ম্যাকবেথ।

রাজপুরুষরা যখন রাজার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করছেন সেই অবসরে ম্যালকম আর ডোনালবেন দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পলায়ন করলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, যে শত্রু রাজাকে হত্যা করেছে, রাজ্যলোভেই একাজ সে করেছে, তাই তাঁদের জীবনও নিরাপদ নয়। তাঁরা পালালেন দক্ষিণ দিকে। ইংলণ্ডের রাজার আশ্রয় নেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য।

তাঁরা পালিয়েছেন শুনে ম্যাকবেথ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন রাজপুত্রেরা এভাবে পালালেন কেন? নিজেরা দোষী না হলে এভাবে পালানোর কোন অর্থ হয়না। নিশ্চয়ই রাজ্যলোভে তাঁরাই একাজ করেছেন।

রাজ্য রাজাহীন থাকতে পারেনা। রাজবংশীয় বলতে ম্যাকবেথই এখন আছেন। সুতরাং সকলে তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নিলে। ডাইনীদের তৃতীয় ভবিষ্যৎবাণীও সফল হল।

॥ ছয় ॥

ম্যাকবেথ রাজা হলেন। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। কেবলই মনে পড়ে তার বংশে রাজপথ স্থায়ী হবেনা। ডাইনীদের কথায় তো আর অবিশ্বাস করা যায়না, তারা বলেছে, ম্যাকবেথের পরে ব্যাংকোর বংশধরেরাই রাজা হবে। ম্যাকবেথ চিন্তা করছেন। অনবরত ভাবছেন। ব্যাংকোকে আর তাঁর ছেলে ফ্লিয়ান্সকে যদি হত্যা করা যায় তাহলে তো

ব্যাংকোর বংশ রইল না। রাজপদ তাহলে আর ব্যাংকোর বংশে যাবে কেমন করে? হ্যাঁ, এই পথ। এছাড়া আর পথ নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যাকবেথ এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করলেন। তিনি সিংহাসন পেয়েছেন সেই উপলক্ষ্যেই এই ভোজ। রাজ্যের গণ্যমান্য লোকদের নেমন্তন্ন হল, ব্যাংকো ও তাঁর পুত্র ফ্লিয়ান্সও নিমন্ত্রিত হলেন।

এদিকে ম্যাকবেথ দু'জন হত্যাকারী নিযুক্ত করলেন। ভোজের সন্ধ্যায় তারা পথের ধারে ওৎ পেতে রইল। ব্যাংকো ও ফ্লিয়ান্স যখন একটা বাগানের পাশ দিয়ে ভোজসভার দিকে আসছেন তখন হত্যাকারী দু'জন তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাংকো নিহত হলেন। ফ্লিয়ান্স হত্যাকারীকে এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন।

ওদিকে ম্যাকবেথের প্রাসাদে ভোজ সুরু হয়েছে। ভোজন কক্ষ আলোয় ঝলমল করছে। দুর্লভ রাজভোগ টেবিলে টেবিলে সাজানো। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সব নিজ নিজ আসনে বসেছেন। সঙ্গে সুন্দরীর দল।

ম্যাকবেথ ঘুরে ঘুরে সবাইকার সঙ্গে মিষ্টালাপ করছেন। ব্যাংকো আসেননি দেখে বারবার দুঃখ প্রকাশ করছেন। কথা বলতে বলতে তিনি মাঝখানে যে উঁচু আসনটি তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল সেই আসনের দিকে অগ্রসর হলেন — এক পা — দু'পা। তার পরেই তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। তাঁর সিংহাসনে বসে আছে ওকে? ও যে স্বয়ং ব্যাংকো!

ব্যাংকো তো মরে গিয়েছে। এ খবর তো তিনি হত্যাকারীদের মুখে ইতিমধ্যে শুনেছেন! তবে রক্তমাখা ঐ মূর্তি কার? ওকি ব্যাংকোর প্রেতাত্মা!

অতিথিরা কেউ সে ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছেন না। এমন কি লেডী ম্যাকবেথও না। দেখছেন একমাত্র ম্যাকবেথ। দেখতে দেখতে তাঁর মাথা গোলমাল হয়ে গেল। পাগলের মত চিৎকার করতে

লাগলেন - কেন এসেছো। তুমি বলতে পারোনা যে একাজ আমিই করেছি। যাও চলে যাও, আমি সহ্য করতে পারছি না। যাও, যাও—

হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে থেকে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হল। অতিথিরা ম্যাকবেথের এবম্বিধ প্রলাপ শুনে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক। কাকে এসব বলছেন ম্যাকবেথ। কেউ তো কিছু দেখতে পাচ্ছেনা।

স্বামীর অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন লেডী ম্যাকবেথ। অতিথিদের সম্বোধন করে বললেন—আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমার স্বামীর মাঝে মাঝে এরকম মাথা গরম হয়। ছেলেবেলাতেই এর সুরু। রাজার শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে অসুখটা বেড়ে গেছে। এখনি সামলে উঠবেন। আপনারা ঠাণ্ডা হয়ে বসুন।

অতিথিদেব এই কথা বলে স্বামীকে একান্তে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনা করে বললেন—কি করছ তুমি! স্থির হও। তোমার আচরণে সবাই সন্দেহ করবে যে! ঠাণ্ডা হও, নিজের আসনে বসে ভোজে যোগ দাও। নইলে সব পণ্ড হবে।

ম্যাকবেথ নিজেকে সামলে নিলেন। আসনে বসে এক পাত্র পানীয় তুলে নিয়েছেন। সবাইকার স্বাস্থ্য কামনা করে পাত্র মুখের কাছে তুল-লেন। এমন সময় আবার সেই প্রেতাত্মা। ম্যাকবেথ আবার সব ভুলে চিৎকার করতে লাগলেন—চলে যাও, দূর হও।

এরপর অতিথিরা আর থাকতে রাজী হলেন না। ভোজসভা ভেঙে গেল। নানা রকম সন্দেহ নিয়ে সবাই চলে গেলেন।

॥ সাত ॥

পরের দিনই ম্যাকবেথ ডাইনীদের সেই জলার ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আরো ভবিষ্যৎ জানতে চান। ব্যাংকো মরেছে কিন্তু তার ছেলে বেঁচে আছে। তাকে সরানোর জন্যে ম্যাকবেথের চেষ্টা কি সফল হবে না? এসব কথা জানতে হবে।

ডাইনীরা তৈরী হয়েই ছিল। তাদের সামনে গন্‌গনে আগুনে একটা প্রকাণ্ড কড়ায় সাপ, ব্যাঙ, প্যাঁচা, শেয়ালের নাড়িভুড়ি, নেকড়ের দাঁত, হাঙরের চোয়াল আর বিষাক্ত হেনলকের শিকড় সিদ্ধ হচ্ছিল, ধোঁয়া আর দুর্গন্ধ চারদিকে।

ম্যাকবেথ এসেই তাদের দেখে প্রশ্ন করলেন— আমার কথা কি জান, বল।

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে ডাইনীরা কড়াটা আগুনের মধ্যে উল্টে দিল। অমনি আকাশে কড়কড় শব্দে বাজ ডাকল আর একটা লোহার টুপি পরা কবন্ধ ম্যাকবেথের দৃষ্টিগোচর হল।

কবন্ধ বলে উঠল ম্যাকবেথ! ম্যাগডাফকে সাবধান!

ম্যাগডাফ! হ্যাঁ ওই লোকটা ম্যাকবেথকে বেগ দেবে বলে মনে হচ্ছে। ভূতের কথা ঠিক।

কবন্ধ অদৃশ্য হল। আবার বাজ ডাকল। এবার এলো দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি— রক্তমাখা একটা শিশু। সে বললে ম্যাকবেথ! রক্তপাত করতে ভয় পেও না। তোমার কোম আশংকা নেই। নারী গর্ভজাত কোন সন্তান তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

শুনে ভারী আশ্বস্ত আর খুসী হলেন ম্যাকবেথ। তবে আর ম্যাকডাফকে ভয় কিসের? নারী গর্ভের সন্তান কে নয়? ম্যাকডাফও তো মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। এলো তৃতীয় ছায়ামূর্তি—মুকুটপরা এক বালক, তার হাতে একটা বিরাট গাছ। সে বলল—ম্যাকবেথ! তোমার ভয় নেই। বার্ণাম বন যতদিন না ডানসিনান পাহাড়ে উঠে আসছে ততদিন তোমার কোন ভয় নেই।

ম্যাকবেথ আনন্দে অধীর হলেন। ব্যাস! আর তাহলে তাঁকে পায় কে? একটা বন কি করে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসবে! গাছের কি পা আছে?

॥ আট ॥

এদিকে পাপের ফল হাতে হাতে ফলতে শুরু করেছে। লেডী ম্যাকবেথের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ঘুরে বেড়ান! বিড় বিড় করে আপন মনে কথা বলেন। চিকিৎসকেরা বলেন—এ ব্যাধি মনের, দেহের নয়! এ রোগের ওষুধ নেই!

ম্যাকবেথ রেগে বললেন মনের ব্যাধির ওষুধ নেই? তাহলে দূরে ফেলে দাও তোমাদের ওষুধের বাকস।

কিন্তু স্ত্রীর অসুখ নিয়ে ভাববার সময় তাঁর নেই। তিনি ম্যাকডাফকে ধরে আনবার জন্যে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু চতুর ম্যাকডাফ অবস্থা বুঝে আগেই ইংলণ্ডে পালিয়েছিলেন। ম্যাকবেথের সৈন্যরা তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের হত্যা করে ফিরে এলো।

সারা দেশে দারুণ অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠল। সবাই কানাকানি করতে লাগল—রাজা ডানকান ও সেনাপতি ব্যাংকোকে ম্যাকবেথই হত্যা করেছেন। ম্যাকডাফের দেখাদেখি অনেক গণ্যমান্য লোক ইংলণ্ডে চলে গেলেন। সেখানে রাজা এডওয়ার্ডের আশ্রয়ে যুবরাজ

ম্যালকম ও রাজপুত্র ডোনালবেন বাস করছেন। ম্যালকম ও অন্য সকলকার একান্ত অনুরোধ ইংলণ্ডের রাজা স্কটল্যাণ্ডের অরাজকতা দূর করবার জন্যে সচেষ্ট হলেন এবং ম্যাকবেথকে দমন করবার জন্যে সেনাপতি সিউওয়ার্ডের অধীনে একদল সৈন্য পাঠালেন। সিউওয়ার্ড ম্যালকম, ম্যাকডাফ ও অন্যান্য থেন ও যোদ্ধাদের নিয়ে সৈন্য সমভিব্যাহারে স্কটল্যাণ্ডে প্রবেশ করলেন।

ম্যাকবেথ হাসলেন। কোন্ শত্রু তাঁর কি করতে পারে? ডাইনীরা বলেছে, বার্ণাম কানন যতদিন না তাঁর এই ডানসিনান পার্বত্য দুর্গে না উঠে আসছে ততদিন তাঁর কোন ভয় নেই।

হঠাৎ অন্তঃপুরে রোদনের রোল! কি ব্যাপার! খবর এলো লেডী ম্যাকবেথ মারা গেছেন! একটা নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাকবেথ বললেন—এজীবন যেন একটা ছোট বাতি, যেন একটা চলমান ছায়া!

ভগ্নদূত এসে একটা ভয়ংকর সংবাদ শোনাল। বার্ণাম বন উঠে আসছে ডানসিনান পাহাড়ের মাথায়।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন ম্যাকবেথ! অবিশ্বাস্য কথা! প্রতারণা! এ হতে পারেনা। একটা গোটা বন কখনো

কিন্তু বেরিয়ে এসে তিনি সভয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, সত্যিই, বার্ণাম বন ধীরে ধীরে উঠে আসছে পাহাড়ের মাথায়। আসলে ব্যাপারটা হল, ইংরেজ-সৈনারা শত্রুর তীর থেকে নিজেদের বাঁচার জন্যে বার্ণাম বনের এক একটা গাছের ডাল কেটে তাই সামনে ধরে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসছে। দূর থেকে সৈন্যদের চোখে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন ডালের আড়ালে একটা বন ক্রমশ উপরে উঠে আসছে।

তাহলে ডাইনীরা ম্যাকবেথের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই কি তাহলে বার্ণাম বন উঠে আসার অর্থ?

পাপী হলেও ম্যাকবেথের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল না। যুদ্ধ

করতে জানতেন। তাই ভয় পেলেন না। রণসাজে সেজে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর অস্ত্রের আঘাতে বহু শত্রু সৈন্য মারা পড়ল।

তখন এগিয়ে এলেন ম্যাকডাফ। ম্যাকবেথের ভয় হল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল মুকুটপরা প্রেতের আশ্বাস—নারী গর্ভে যার জন্ম সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

এই আশ্বাসে তিনি নির্ভয়ে ম্যাকডাফকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ করলেন অসীম বীরত্বের সঙ্গে। বললেন, যার নারী গর্ভে জন্ম তাকে আমি ভয় করিনা।

কিন্তু যখন ম্যাকডাফের মুখে শুনলেন, স্বাভাবিকভাবে ম্যাকডাফ ভূমিষ্ঠ হননি, চিকিৎসকের হাত তাঁকে টেনে মাতৃজঠর থেকে বার করেছিল, তখন বিষম আতংকে ভীত হলেন ম্যাকবেথ। ডাইনীরা তাহলে এদিক দিয়েও তাঁকে ফাঁকী দিয়েছে।

আজ স্ত্রী পুত্র কন্যার হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছেন ম্যাকডাফ, তাই মরীয়া হয়ে তিনি লড়ছেন। আর বীর হলেও নিজের পাপের ভারে ম্যাকবেথ দুর্বল হয়ে পড়লেন, গভীর হতাশায় তাঁর মন বিক্ষুব্ধ, তাঁর হাত কাঁপছে তলোয়ার চালাতে, পা টলছে, মাথা ঘুরছে।

ধর্মের জয় হল শেষ পর্যন্ত। ম্যাকডাফের হাতে ম্যাকবেথ নিহত হলেন। যুদ্ধ শেষ হল।

ম্যাকবেথের ছিন্নমুণ্ড ম্যালকমকে উপহার দিয়ে ম্যাকডাফ তাঁকে স্কটল্যাণ্ডের রাজা বলে অভিবাদন জানালেন।

হাউণ্ড অফ বাস্কারভিল্‌ : কোনান ডয়েল

প্রায় চারশো বছর আগে ইংলণ্ডে বাস্কারভিল নামে এক জমিদার বংশ ছিল।

তাদের মধ্যে একজন জমিদার ছিল অত্যন্ত অসৎ, অত্যাচারী ও লম্পট। তার নাম হিউগো বাস্করভিল।

কয়েকজন মোসাহেব নিয়ে হিউগো নানা রকম কুকর্ম করে বেড়াতো এবং প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভগবানের হাতে সে ভয়ঙ্কর শাস্তি পেল।

একদিন হিউগো জোর করে এক প্রজার মেয়েকে ধরে এনে নিজের প্রাসাদে বন্দী করে রাখল।

মেয়েটি অনেক কাকুতি মিনতি করল কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। তাকে উপরতলার একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে ইয়ারদের নিয়ে হিউগো নিচের তলায় বৈঠকখানায় বসে মদ খেতে লাগল আর হৈ-হল্লায় মেতে উঠল।

মেয়েটা ছিল চালাক। সে দেখলে, আর তো কোন উপায় নেই। তখন সে বিছানার চাদরটা জানলায় বেঁধে জানালা দিয়ে বেরিয়ে সেই চাদর বেয়ে নীচে নেমে এলো। তারপর প্রাণপণে ছুটলো নিজের বাড়ীর দিকে।

একজন ভৃত্য কিছুক্ষণ পরে এসে জানাল মেয়েটা পালিয়েছে। শুনে হিউগো যেন ক্ষেপে গেল। মোসাহেবদের জিজ্ঞেস করলে, এখন কি করা যায়।

মোসাহেবরা নানা পন্থা বাৎলাতে লাগল, একজন বললে—কুকুর লেলিয়ে দাও।

হিউগোর তখন মাথার ঠিক নেই। বললে সেই ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরের দল ছেড়ে দেওয়া হল। বড় বড় ডালকুত্তা ছুটলো মেয়েটাকে ধরবার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে হিউগো আর তার মোসাহেবরাও বেড়িয়ে পড়ল মেয়েটার খোঁজে। মাঠে গিয়ে চারদিক তাকিয়ে কোথাও কাউকে দেখা গেল না।

হিউগো চলে গেল অন্যদিকে।

আরও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে মোসাহেবরা যেদিকে হিউগো ছুটে গেছে সেদিকে অগ্রসর হল।

কিছুটা দূর যেতেই যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতে তাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

মাঠের এক জায়গায় মেয়েটা মরে পড়ে রয়েছে। তার কয়েক হাত দূরে হিউগো উপুড় হোয়ে পড়ে আছে। আর তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে একটা ভীষণাকৃতি কুকুর হিউগোর ঘাড় থেকে রক্ত চুষে খাচ্ছে।

তারা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রাণভয়ে পালাল।

সেই ঘটনার পর থেকেই বাস্কারভিল বংশের লোকেরা প্রায়ই নানা দুর্ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হতে লাগল।

যদিও তারপর অনেকদিন কেটে গেছে তবুও তাদের সে ভয়টা যায় নি।

*　　　*　　　*

অনেকদিন পরে বাস্কারভিল বংশের অধিকারী স্যার চার্লস বাস্কারভিল আফ্রিকা থেকে প্রচুর টাকা রোজগার করে দেশে এলেন এবং নিজেদের প্রাসাদে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন।

পুরনো অট্টালিকা ভেঙ্গে-চুরে অনেক অর্থব্যয় করে নতুন করে তৈরী করালেন এবং নানা সদনুষ্ঠানে বিস্তর দান করতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই হিউগো বাস্কারভিলের কাহিনীটা তাঁর কানে গেল এবং তাঁর কেন জানি বিশ্বাস হল যে তাঁর অদৃষ্টেও এই রকম ভয়াবহ মৃত্যু লেখা আছে।

আর, হোলও তাই। একদিন রাত্রে আহারের পর বাগানে পায়চারী করতে গেলেন, আর ফিরলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাঠের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল। ডাক্তারেরা মত দিলেন, ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখে ভয় পেয়ে হার্টফেল করে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। শুধু তাঁর মৃতদেহ থেকে দু'চার হাত তফাতে একটা বড় কুকুরের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছিল।

স্যার হেনরি বাস্কারভিল নামে স্যার চার্লসএর এক ভাইপো থাকতেন আমেরিকায়। তিনিই হলেন অতঃপর সেই বংশের উত্তরাধিকারী। তাঁকে খবর দিয়ে আনানো হল। কিন্তু তার আগে চার্লসের ডাক্তার ডাঃ মার্টিমার শার্লক হোমস এর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন। ডাঃ মার্টিমারই মৃতদেহের পাশে কুকুরের পায়ের ছাপ দেখেছিলেন এবং ব্যাপারটা তাঁকে নানাভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল।

শার্লক হোমস সব শুনে তাঁদের সাহায্য করতে সম্মত হলেন এবং স্যার হেনরির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

এদিকে হেনরি যেদিন দেশে পৌছোলেন সেই দিনই তিনি একটা উড়ো চিঠি পেলেন। তাতে লেখা ছিল স্যার হেনরি যেন খুব সাবধানে থাকেন এবং কদাচ মাঠের দিকে একা যেন না যান।

হেনরি সেইদিনই চিঠিখানা হাতে নিয়ে শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করলেন।

চিঠিখানা পড়ে শার্লক হোমস বুঝলেন, কোন লোক হেনরির গতিবিধির উপর নজর রেখেছে। তিনি হেনরিকে একা বাস্কারভিলে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, আপনি এখন আমার বন্ধু ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে যান। সে খুব জবরদস্ত মানুষ। তারপর আমার হাতের কাজগুলো সেরে আমি যাব। ইতিমধ্যে আমায় যা জানাবার তা ওয়াটসনই জানাবে।

* * *

শার্লক হোমস-এর নির্দেশ মত ওয়াটসন হেনরির সঙ্গে বাস্কারভিল

গেলেন। স্থির হল. সেখানে সব দে:খশুনে ওয়াটসন প্রত্যহ শার্লক হোমসকে একটা করে পত্র দেবেন।

বাস্কারভিলে পৌছে ওয়াটসন দেখলেন, জায়গাটা একদম ফাঁকা। কাছাকাছির মধ্যে বিশেষ ঘরবাড়ি নেই যেন জনবিরল মরুভূমি। দু'এক ঘর চাষাভূষোর বাস। তাছাড়া চারদিক পাথুরে মাঠ, ধু ধু করছে।

ভদ্রলোক বলতে সে তল্লাটে থাকেন স্টেপলটন নামে এক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, তাঁর সঙ্গে থাকেন তাঁর এক ভগ্নী। স্টেপলটন গাছপালা পোকামাকড় নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই বললেই হয়।

বাস্কারভিলে দু'একদিন বাস করার পরেই ওয়াটসনের সন্দেহ হল, স্যার চার্লস-এর আমলের ভৃত্য ব্যারিমোর আর তার স্ত্রীকে।

ব্যারিমোরই প্রথম চার্লস-এর মৃতদেহ দেখতে পায়। স্যার চার্লস এর উইল অনুসারে সে কিছু টাকাও পেয়েছে। তাঁরা যেতেই সে চাকরিতে ইস্তফা দিতে চাইল। শুধু তাই নয়, তার একটা মিথ্যা কথা ধরা পড়ে গেল। তাঁর স্ত্রী রাত্রে কাঁদছিল, তা হেনরিও ওয়াটসন দুজনেই টের পান। কিন্তু সকালে ব্যারিমোরকে জিজ্ঞাসা করতে সে তার স্ত্রীর কান্নার কথা বেবাক উড়িয়ে দিলে। ওয়াটসন বুঝলেন, লোকটার মধ্যে গোলমাল আছে।

পরের দিন ওয়াটসন সজাগ রইলেন। তাঁর রাত জাগা নিষ্ফল হল না দেখলেন, ব্যারিমোরের ঘর থেকে একটা আলোর রেখা বেরুচ্ছে; বুঝলেন সে আলোর সাহায্য কাউকে সংকেত জানাচ্ছে আর দূরে মাঠের মধ্য থেকে তার সাড়া আসছে।

তখন হেনরি আর ওয়াটসন দু'জনে চেপে ধরলেন। ব্যারিমোর স্বীকার করলে যে আলো সেই দেখাচ্ছিল তার স্ত্রীর ছোট ভাইকে।

সে গুরুতর অপরাধ করে জেলে ছিল, সম্প্রতি জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। পুলিশের ভয়ে সে পাহাড়ের ধারে লুকিয়ে আছে। ব্যারিমোর

প্রত্যহ গিয়ে তাকে খাবার দিয়ে আসে। তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে ব্যারিমোর চেষ্টা করছে।

কথাটা তাঁদের পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। তাই পরের দিন সন্ধ্যার পর স্যার হেনরি এবং ওয়াটসন দু'জনে পাহাড়ের দিক গেলেন।

ব্যারিমোরের সম্বন্ধীকে তাঁরা অবশ্য দেখতে পেলেন বটে, কিন্তু ধরতে পারলেন না, লোকটা ছুটে পালালো।

কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা একটা আশ্চর্য ব্যাপার জানতে পারলেন। ব্যারিমোরের সম্বন্ধী ছাড়া আরও একটা লোক সেখানে লুকিয়ে আছে। দূর থেকে তাকে একবার দেখা গেল কিন্তু তার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

আরও কিছু খোঁজখবর নিয়ে ওয়াটসন জানলেন সেই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটা কিছুদিন যাবৎ ঐখানেই আছে এবং একটা বাচ্চা চাকর তাকে লুকিয়ে খাবার দিয়ে যায়। ওয়াটসন স্থির করলেন, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে।

ইতিমধ্যে ব্যারিমোরের কাছে জানা গেল, সে দৈবাৎ একটা আধপোড়া চিঠি দেখতে পেয়েছে, তাতে মিসেস লরা লিয়নস নামে এক মহিলা স্যার চার্লসকে তাঁর মৃত্যুর দিন রাত দশটার পর বাগানের গেটের কাছে দেখা করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

খবরটা শুনে ওয়াটসন এবং স্যার হেনরি দু'জনেই খুব আশ্চর্য হলেন।

জানা গেল, মিসেস লিয়নসের স্বামী অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, তিনি স্ত্রীর খরচপত্র কিছুই দেন না। স্যার চার্লস মধ্যে মধ্যে তাঁকে সাহায্য করতেন বলেই কোন রকমে তিনি দিনপাত করতেন।

কিন্তু অত রাত্রে নির্জনে দেখা করবার অনুরোধ কেন?

ওয়াটসন সেই দিনই মিসেস লিয়নসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

প্রথমে মহিলাটি কোন কথাই বলতে চাইলেন না। কিন্তু ওয়াটসন যখন তাঁকে তাঁর চিঠির কথা জানালেন তখন মহিলাটি মুখ খুললেন,

অত্যন্ত বিব্রতভাবে বললেন, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চান এবং সেজন্য তাঁর কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। লজ্জাজনক কথা কারুর সামনে বলতে দ্বিধাবোধ করছিলেন বলেই রাত্রে নির্জনে দেখা করবার জন্য স্যার চার্লসকে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছিলেন।

ওয়াটসন সব শুনে প্রশ্ন করলেন—আপনি গিয়ে কি দেখলেন?

মহিলাটি উত্তর দিলেন—আমি যাই নি।

—যান নি! কেন?

মিসেস লিয়নস বললেন— অন্য এক ভদ্রলোক তার আগেই তাঁকে টাকা দিতে রাজী হয়েছিলেন, তাই স্যার চার্লস-এর কাছে যাবার আর দরকার হয় নি।

অন্য এক ভদ্রলোক? তাহলে তিনি শুধু স্যার চার্লসকেই অনুরোধ করেন নি! অন্য লোককেও তাঁর প্রয়োজনের কথা জানিয়েছেন। কে তিনি?

প্রথমটা ইতঃস্তত করে মিসেস লিয়নস জানালেন, তিনি স্টেপলটন।

আর কোন কথাই মিসেস লিয়নস বললেন না। ওয়াটসন ফিরে এলেন।

মিসেস লিয়নসের সঙ্গে দেখা করে ওয়াটসন ফেরবার পথে দেখতে পেলেন একটি ছেলে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। বুঝলেন, ব্যারিমোরের সম্বন্ধী ছাড়া আর যে লোকটা মাঠের মধ্যে থাকে ছেলেটা তার জন্যেই খাবার নিয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটার অলক্ষ্যে থেকে অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, প্রাচীনকালের পাথরের তৈরী ঘরবাড়ির যেসব ভগ্ন স্তূপ পড়ে আছে তারই একটায় লোকটা থাকে।

ছেলেটা বেরিয়ে চলে যাবার পর তিনি সেই ঘরে ঢুকলেন।

ভাঙাঘরের কোণে একটা কম্বল। একটা টিনে খানিকটা জল আর পাশে আলো জ্বালার সরঞ্জাম। এই তার সম্বল! একটা পাথরের

ওপর খাবারের কৌটো, যা এইমাত্র ছেলেটা দিয়ে গেল ; এগিয়ে গিয়ে ওয়াটসন দেখলেন, কৌটোর নীচে এক টুকরো কাগজ, তাতে লেখা :

"মিঃ ওয়াটসন আজ মিসেস লিয়নসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।"

কী আশ্চর্য। কে এই ব্যক্তি যে এমন করে তাঁর গতিবিধির উপর নজর রেখেছে।

ওয়াটসনের বিস্ময়ের অবধি নেই।

না এর মীমাংসা করে যেতে হবে, লোকটার পরিচয় জানা চাই। দেখা যাক।

বেশীক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই বাইরে শব্দ শোনা গেল। কে যেন আসছে।

ওয়াটসন একটা দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পিস্তল বার করে বাগিয়ে ধরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

পদশব্দ কাছে এসে দরজার বাইরে থামলো, তারপর পরিষ্কার এবং বিশেষ পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

"পিস্তলটা পকেটে পুরে ফেলো, ওয়াটসন! বিপজ্জনক ব্যাপার হঠাৎ ঘটে যেতে পারে।"

ওয়াটসন বিহ্বল, স্তম্ভিত।

—হোমস! তুমি! তুমিই মাঠের সেই অপরিচিত লোক? কিন্তু আমি যে এখানে আছি তা জানলে কেমন করে?

শার্লক হোমস হেসে জবাব দিলেন—তুমি যে বিশেষ চুরুটটি খাও সেই চুরুট যখন অর্ধদগ্ধ অবস্থায় দরজার বাইরে পড়ে ধোঁয়াচ্ছে দেখলাম তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে তুমি সন্ধান করে এখানে এসেছো আর ভিতরে ঢোকবার আগে চুরুটটা ফেলে দিয়ে গেছ!

দুজনেই দুজনকে দেখে মহা খুশী।

শার্লক হোমস বললেন—হ্যাঁ, আমিই ক'দিন ধরে এখানে আড্ডা গেড়েছি। পাছে কথাটা কোন রকমে ফাঁস হয়ে পড়ে তাই তোমাকে

অবধি জানাইনি। যাক, আমার যা করবার ছিল তা শেষ হয়েছে, এইবার আমি লোকালয়ে যাব। কিন্তু তুমি এতক্ষণ ধরে স্যার হেনরি কে একলা রেখে এলে কেন? কাজটা ভাল করনি। তাঁর বিপদ যে কত গুরুতর তা জান না।

ওয়াটসন আর হোমস দু'জনে স্যার হেনরির বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন।

কিছুদূর যেতেই সহসা তাঁরা একটা বিকট আর্তনাদ শুনতে পেলেন। কে যেন ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচাচ্ছে। হোমস সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটলেন।

খানিকটা গিয়েই দেখতে পেলেন, একটা লোক উপুড় হোয়ে পড়ে আছে। তার দেহ নিথর নিস্পন্দ। লোকটা মারা গেছে।

লোকটার অঙ্গে যে পোষাক ছিল তা স্যার হেনরির। ওয়াটসন ও ততক্ষণে এসে পড়েছিলেন। দু'জনেই প্রথমটা যেন বজ্রাহত হলেন। ওয়াটসনের অসাবধানতায় বুঝি যা ভাবা গিছল তাই ঘটে গেছে। কিন্তু তারপর লোকটার মুখ দেখে তাঁদের ভয় দূর হল।

লোকটা ব্যারিমোরের সেই সম্বন্ধী।

ওয়াটসনের মনে পড়ল, স্যার হেনরি তার আগের দিন কয়েকটা পুরানো পোষাক ব্যারিমোরকে দিয়েছিলেন। তা থেকে ব্যারিমোর দু'একটা পোশাক নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধীকে দিয়ে গিয়েছিল।

ওয়াটসনের মুখে এই খবর শুনে হোমস বললেন তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সেই পোষাকই বেচারার কাল হল। কুকুরটা পোষাকের গন্ধ পেয়ে তাকেই স্যার হেনরি ভেবে তাড়া করেছিল। লোকটা ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে উঁচু পাথর থেকে পড়ে মারা গেছে।

তাঁরা দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এমন সময় কোথা থেকে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন স্টেপলটন।

শার্লক হোমসকে এখানে দেখে তিনি রীতিমত অবাক হলেন।

তারপর ওয়াটসনকে প্রশ্ন করলেন—এখানে একটা চিৎকার শুনলাম না? ও কি! স্যার হেনরির দেহ নাকি?

শার্লক হোমস তাঁর ভুল ভেঙে দিলেন। দু'চার কথার পর স্টেপলটন চলে গেলেন। ওয়াটসন হোমসকে নিয়ে বাস্কারভিল প্রাসাদে ফিরে এলেন।

সার হেনরি হোমসকে দেখে মহা আনন্দিত হলেন. সেই সঙ্গে এই মাত্র যে ঘটনাটা ঘটেছে তার বিষয় জেনে ভয়ও পেলেন! অতিথি সংকারের আয়োজন করতে অতঃপর তিনি ভিতরে গেলেন।

বড় হলঘরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ হোমসের নজরে পড়ল, দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে স্যার হেনরির পূর্বপুরুষদের ছবি। তার মধ্যে একটা ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে হোমস প্রশ্ন করলেন ওয়াটসনকে এটি কার ছবি, তুমি জান?

ওয়াটসন বললেন জানি। এটি হিউগো বাস্কারভিলের ছবি।

হোমস আর কোন কথা না বলে ছবিটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছবির গলার কাছটা হাত দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন—শুধু মুখটা দেখা যেতে লাগল। সেই মুখ দেখে ওয়াটসন সবিস্ময়ে বললেন—এ কি! এ যে হুবহু স্টেপলটনের মুখ।

হোমস বললেন—হ্যাঁ. বংশগত আদল যাবে কোথায়?

তারপর সব কথা সবিস্তারে ওয়াটসনকে জানালেন।

এখানে এসেই তাঁর স্টেপলটনকে সন্দেহ হয়। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন স্টেপলটন এই বংশেরই ছেলে। যাকে সবাই নিঃসন্তান অবস্থায় আমেরিকায় মারা গেছে বলে জেনেছিল বাস্কারভিলের সেই একজন উত্তরাধিকারীর ছেলে ওই স্টেপলটন। নাম ভাঁড়িয়ে সে এখানে এসে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী সেজে বসেছে এবং একটা ভয়ঙ্কর কুকুর পুষেছে। সেই কুকুরকে দিয়ে সে একে একে এই বংশের সবাইকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। সবাই খতম হলে সে নিজের পরিচয় দিয়ে বিষয় দাবী করবে এই তার মতলব। যে স্ত্রীলোকটি তার বোন সেজে

থাকে, সে আসলে তার বোন নয়—স্ত্রী। স্টেপলটন আগেও বহু কুকার্য করেছে। তার স্ত্রী তার কার্যকলাপ মোটেই পছন্দ করত না। সে-ই স্যার হেনরি এখানে আসামাত্র তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল।

পরের দিন মিসেস লিয়নসের কাছে যেতেই ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল।

স্টেপলটন বিবাহিত, তার স্ত্রী বর্তমান, এই খবর জেনে মিসেস লিয়নস জ্বলে উঠলেন। তার মুখ খুলে গেল।

স্টেপলটন তাঁকে কেমন করে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী করায়, তারপর পূর্ব বিবাহটা বিচ্ছেদের খরচের জন্যে স্যার চার্লস-এর কাছে পত্র লেখায় এবং শেষে আবার তাকে বলে যে আত্মসম্মানের জন্যে খরচ ভিক্ষে করার দরকার নেই, সমস্ত খরচ স্টেপলটন দেবে, এই সব কথা মিসেস লিয়নস গড়গড় করে বলে গেলেন।

তখন হোমস তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে শুধু তাঁর নাম করে স্যার চার্লসকে গভীর রাত্রে বাড়ীর বাইরে আনাই স্টেপলটনের উদ্দেশ্য ছিল। বিবাহের প্রস্তাবটা নিছক ধাপ্পা। তখন মিসেস লিয়নস আরও মুসড়ে পড়লেন এবং কতকটা তারই জন্যে স্যার চার্লস মারা পড়ছেন বুঝতে পেরে অত্যন্ত কাতর হোয়ে পড়লেন।

* * *

প্রমাণ সবই যোগাড় হল। এখন শুধু হাতেনাতে ধরার অপেক্ষা।

কুকুরটাকে স্টেপলটন কোথায় লুকিয়ে রাখে তা তখনো পর্যন্ত হোমস জানতে পারেন নি। পরে অবশ্য জেনেছিলেন।

যে পড়ো অনুর্বর মাঠের কথা আগে বলা হয়েছে সেই মাঠ আর পাহাড়ের মাঝে একটা জলা ছিল। জলাটা চোরা বালি আর পাঁকে ভর্তি। গভীর সেই পাঁক। একবার পড়লে আর ওঠা অসাধ্য। তলিয়ে যেতে হবেই। তারই মধ্যে ছিল একটা সরু পাথরের পথ। তার উপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে গিয়ে স্টেপলটন সেই পাহাড়ের একটা গুহায় কুকুরটাকে লুকিয়ে রাখতো। যে পাথরগুলোর

উপর দিয়ে সে যাতায়াত করতো সেগুলো ছাড়া অন্য কোথাও পা পড়লেই, ব্যস। পাঁকের মধ্যে সমাধি অবশ্যম্ভাবী। সেদিকটা এমনি ভয়ঙ্কর নির্জন যে কোন লোক সেদিকে যেতো না পাঁক পার হয়ে পাহাড়ে যাওয়া তো দূরের কথা।

হোমস সে সুযোগ খুঁজছিলেন, দৈবক্রমে শীঘ্রই সে সুযোগ এসে গেল।

একদিন স্টেপলটন সার হেনরিকে তার বাড়িতে নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানালো।

হোমস তাঁকে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য ব'লে সবাইকে জানিয়ে ওয়াটসনকে নিয়ে সেই দিনই লণ্ডন যাত্রা করলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি লণ্ডন গেলেন না। পথে এক জায়গায় নেমে পড়ে দু'তিনজন পুলিশের লোককে সঙ্গে করে সন্ধ্যার পর চুপি চুপি ফিরে এলেন। পুলিশকে বলে কয়ে সব ঠিক করে রাখলেন।

ভোজ সেরে অনেক রাত্রে সার হেনরি স্টেপলটনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের প্রাসাদ অভিমুখে চললেন।

নিশুতি রাত। তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। তিনি জানতেন না হোমস কাছেই রয়েছেন। পাছে স্টেপলটন কোন রকমে তাঁর মতলব জানতে পারে তাই তিনি স্যার হেনরিকে কোন কথা বলেন নি।

খানিকটা এগুবার পরেই যে দৃশ্য স্যার হেনরির চোখে পড়ল তা দেখে তাঁর সারা দেহ থর থর করে কেঁপে উঠে যেন অসাড় হয়ে গেল।

তিনি দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড কুকুর লাফাতে লাফাতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। কুকুরটার সারা গা দিয়ে, চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

চীৎকার করে উঠে স্যার হেনরি ছোটবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। এর ফলে কুকুরটা তাঁর দেহের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্যার হেনরি হতাশ হয়ে চোখ বুজে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েক মুহূর্ত তারপরেই পিস্তলের আওয়াজ হল। পর পর পাঁচবার। অব্যর্থ লক্ষ্য, হোমসের পিস্তলের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে কুকুরটা মরে পড়ে গেল।

তখন সকলে কুকুরটাকে ভাল করে দেখলেন। সত্যিই মরেছে তো? হ্যাঁ, মরেছে।

হাউণ্ড জাতীয় বিরাটাকায় একটা কালো কুকুর, ভীষণ কুৎসিৎ তার মুখটা। তার সারা গায়ে ফসফরাস মাখানো। অন্ধকারে সেই ফসফরাস জ্বলত আর মনে হোত যেন তার দেহ থেকে আগুন বেরুচ্ছে।

স্যার হেনরিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তাঁরা স্টেপলটনকে ধরতে গেলেন। কিন্তু স্টেপলটন পিস্তলের আওয়াজ শুনেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল তাই সে পার্বত্য গুহায় গিয়ে লুকুবে বলে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছিল।

কিন্তু একে ঘন কুয়াসা, তার উপর সে তখন ভীষণ নার্ভাস। তাই পাথরের উপর দিয়ে দ্রুত যেতে গিয়ে পা ফসকে সে পাঁকের মধ্যে পড়ে তলিয়ে গেল এবং সেই পাঁকের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে সে মারা পড়ল।

এই শিহরণ-জাগানো রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন যে পাপের সাহায্য পৃথিবীতে কেউ শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করতে পারে না। যে অসৎ পথে বড় হোতে চায় সে যত বুদ্ধিমানই হোক, শেষ পর্যন্ত সে বুদ্ধি কাজে লাগে না। সে শাস্তি পায়—হয় মানুষের হাতে না হয় দৈবের হাতে—যেমন পেল স্টেপলটন।

অলিভার টুইস্ট্ : ডিকেন্স্

॥ এক ॥

শহরতলীর এক অনাথ আশ্রমে একদিন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। তার জন্মের পরে তার মা মারা গেল। ফলে ছেলেটির পিতৃ-পরিচয় জানা গেল না।

অনাথ আশ্রমের কর্তারা ছেলেটির অভিভাবকের খোঁজে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউই এসে ছেলেটিকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করল না।

কর্তারা ভেবেচিন্তে ছেলেটির নামকরণ করলেন · অলিভার টুইস্ট। অনাথ আশ্রমের সংলগ্ন যে শিশু বিভাগ ছিল সেইখানে অলিভারের স্থান হল।

সেই বিভাগে এক ধাত্রী ছিল, তার নাম মিসেস ম্যাস। সেই ধাত্রীর উপর অলিভারের লালন-পালনের ভার পড়ল।

ধাত্রীটি ছিল যেমন লোভী, তেমনি রূঢ় কর্কশ হৃদয়হীন ছিল তার ব্যবহার। সে শিশুদের বরাদ্দ খোরাকী থেকে প্রচুর চুরি করত, ছেলেদের ঠিকমত খেতে দিত না এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো।

এই নিষ্ঠুর ধাত্রীর কাছে অলিভারের জীবনের ন' বছর কাটল। কী দুর্বিসহ সেই ন' বছর! সেই ন' বছর ধরে অলিভার প্রতিদিন কত কান্নাই যে কেঁদেছে তা জানলেন একমাত্র ভগবান।

ন' বছরে পড়বার পর অলিভারকে শিশুবিভাগ থেকে মূল আশ্রমে আনা হল।

সেখানে তখন খাওয়াদাওয়ার বিষম টানাটানি। ছেলেদের জন্যে কোন খাদ্য নেই, শুধু দিনে তিনবার তিনবাটি সাগু।

কর্তারা বুঝতেন, এই ভেজাল সাগুর জল খেয়ে কোন বাড়ন্ত ছেলে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তাতে তাঁদের মনে বিবেকের কোন দংশন ছিল না। অনাথ ছেলেগুলো যত তাড়াতাড়ি মরে যায় ততই ভাল, তাঁদের খরচ কমে, হাঙ্গামা হ্রাস পায়।

কিন্তু তবুও ছেলেগুলো বড় হোতে লাগল। ক্রমে তারা এই নিদারুণ কষ্টকর অবস্থা মেনে নিতে গররাজি ভাব দেখাতে লাগল। পেটের জ্বালায় তারা ছটফট করতে লাগল। রাতে না ঘুমিয়ে কোলাহল করতে শুরু করল। কেউ বা বলল, পাশের ঘুমন্ত ছেলেটাকেই আজ খেয়ে ফেলব।

অবশেষে মরীয়া হয়ে তারা ঠিক করল, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে হবে, কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে জানাতে হবে।

কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কার এতখানি বুকের পাটা যে কর্তাদের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবে।

ছেলেরা পরামর্শ করে ঠিক করল, লটারী করা হোক, লটারীতে যার নাম উঠবে তাকে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

লটারীতে অলিভারের নাম উঠল। অতএব অলিভারকেই যেতে হবে কর্তাদের কাছে। কোন উপায় নেই।

অলিভার তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুরু দুরু বুকে নিজের খাবারের বাটিটা নিয়ে পরিবেশনকারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পরিবেশনকারী চোখ পাকিয়ে বললে, কী চাও এখানে?

অলিভার বললে, পেট ভরছে না। আমার আর একটু খাবার চাই।

ব্যস! আর যায় কোথায়!

পরিবেশনকারীর চোখ দুটো যেন কপালে উঠল। ছেলেটার আস্পর্ধা তো কম নয়! বলে আরো খাবার চাই?

সে তার হাতের হাতা দিয়ে অলিভারের পিঠে সজোরে ঘা বসিয়ে দিল। তারপর ছুটল আশ্রমের সরকার মিঃ বাম্বল্-এর কাছে।

বাম্বল্ ব্যাপার শুনে ছুটলো আশ্রমের বড়কর্তার কাছে।

কী হয়েছে ?

সাংঘাতিক ব্যাপার ! একটা ছেলে আরো খেতে চাইছে।

শুনে বড়কর্তা যেন স্তম্ভিত ! যা দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট না হোয়ে আবার চাওয়া ? কী ভয়ঙ্কর ছেলে।

কর্তার এক সঙ্গী মন্তব্য করলেন, এ ছেলেটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ একদিন নির্ঘাৎ ফাঁসী যাবে, দেখে নিও তোমরা।

এমন ধারা ছেলেকে তো আর আশ্রমে রাখা যায় না।

কর্তারা স্থির করলেন, পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে দেওয়া হোক। সেই পুরস্কারের লোভে কেউ যদি ছেলেটাকে নিয়ে যায় তো তাঁদের হাড় জুড়োবে।

পাঁচ পাউণ্ডের লোভে এলো এক কবর-ওলা। সে নিজের ব্যবসায়ের শিক্ষানবীশ রূপে অলিভারকে পছন্দ করল এবং পাঁচ পাউণ্ড অর্থ পকেটস্থ করে অলিভারকে নিয়ে গেল।

কিন্তু সেখানেও অলিভার অত্যাচার আর পীড়নের হাত থেকে নিস্তার পেল না।

ব্যবসায়ের অন্যান্য কর্মীরা এবং কবরওলার স্ত্রী তার উপর এমন অত্যাচার করতে লাগল যে সহ্য করতে না পেরে অলিভার একদিন রাত্রে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

সে লণ্ডনের নাম শুনেছিল। জেনেছিল, লণ্ডন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর, সেখানে পৌঁছোতে পারলে সে হয়ত বাঁচবার পথ খুঁজে পাবে, হয়ত একটা আশ্রয় মিলবে তার। এই ভেবে রাস্তার পাথরের চিহ্ন দেখে দেখে সে লণ্ডনের দিকে চলল।

।। দুই ।।

দীর্ঘ পথ। যেন শেষ নেই। পেটে নেই অন্ন, পকেটে নেই একটি কানাকড়ি। তার উপর প্রচণ্ড শীত। অলিভারের হাত পা অসাড় হ'য়ে আসছে। খিদের চোটে দুই চোখে অন্ধকার দেখছে সে।

ক্রমে সকাল হ'ল। কিন্তু এমনি করে আর কতক্ষণ চলা যায়?

ভিক্ষা করবার চেষ্টা করল। একটা গাড়ী যাচ্ছিল। ভিতরে একজন হোমরা-চোমরা আরোহী।

অলিভার গাড়ীর সঙ্গে ছুটতে লাগল আর করুণ স্বরে ভিক্ষা চাইতে লাগল।

কিন্তু লোকটা কি নির্দয়! বহুক্ষণ তাকে গাড়ীর সঙ্গে দৌড় করালো কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি পেনীও দিল না।

অলিভার আর পারল না। রাস্তার পাশে বসে পড়ল। তার মনে হতে লাগল, সে বোধহয় আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। তার মাথা ঘুরছে, শরীর শিথিল অবসন্ন, চোখের সামনে সব ঝাপসা।

ওই বুঝি মৃত্যু আসছে। না। মৃত্যু নয়। একটি ছোকরা। সে এসে অলিভারের সঙ্গে আলাপ করল।

বয়সে সে অলিভারের চেয়ে কিছু বড়। ভারী মিষ্টি কথা আর সদয় ব্যবহার তার। দু'চার কথার পর সে দোকান থেকে খাবার এনে অলিভারকে খাওয়ালো। খাবার খেয়ে অলিভার প্রাণ ফিরে পেলে। ছেলেটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল।

ছোকরা তখন অলিভারের কাছে তার জীবনের কথা শুনল। শুনে বলল, তা তুমি ভাবছ কেন! তোমার উপায় আমি করে দেব।

কী উপায় করবে ভাই?

তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের বুড়োর কাছে। তাহলেই তোমার আর কোন ভাবনা থাকবে না।

অলিভারের বিস্ময় বোধ হল, বললে, বুড়ো ? সে আবার কে ?

ছেলেটি বললে সে এক চমৎকার মানুষ। আমাদের গুরু। তার খুব দয়া। সে তোমায় খেতে পরতে দেবে, কত যত্নআত্তি করবে। সে মানুষ নয় দেবতা। এমনি কত ছেলেকে সে পালন করছে। সে তোমাকে নিশ্চয় আশ্রয় দেবে।

শুনে অলিভার অভিভূত হ'ল।

এমনি একটা আশ্রয়ের জন্য তার মন তখন ব্যাকুল। সে সহজেই ছেলেটির কথা বিশ্বাস করলো এবং তার কথামত তার সঙ্গে চলল।

কয়েকটা আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে তারা একটা নোংরা পল্লীতে এসে এক পুরনো নীচু বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

সেই বাড়িতে থাকে বুড়ো ফ্যাগিন। লোকটা জাতে ইহুদী। সে ছিল চোরদের সর্দার তার চোরাই মালের ব্যবসা। সে চোর পোষে। কয়েকটা ছোকরা চোর তার আশ্রয়ে থাকে। তারা লোকের পকেট মেরে, সিঁদ কেটে চুরী করে যা পায় বুড়োর কাছে এনে দেয়। বুড়ো সেই সব চোরাই মাল বিক্রি করে মোটা টাকা কামায়। ছেলে-গুলোকে অবশ্য সে খেতে পরতে দেয়, আর কিছু কিছু হাতখরচও দেয়।

ফ্যাগিন অলিভারকে খুব যত্ন করল। তাকে পেট ভরে খাওয়ালো। একটা নতুন জামাও দিলে।

অলিভার কৃতার্থবোধ করল বটে কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই আসল ব্যাপার জানতে পেরে তার মন অত্যন্ত দমে গেল। এইভাবে চোরের রাজ্যে তাকে চোর হয়ে বাস করতে হবে ?

কয়েকদিন পরেই সেই ডুখোর ছোকরাটি তাকে বললে, চল, আমার সঙ্গে বেরুতে হবে। তোমায় কাজ শেখাবো। সর্দারের হুকুম।

অনন্যোপায় হয়ে অলিভার তার সঙ্গে রাস্তায় বেরুলো চুরী বিদ্যা শেখবার জন্যে।

পথের ধারে একটা বইএর দোকান। সেখানে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বই দেখছেন। তাঁর কোটের ডানদিকের পকেটে টাকার ব্যাগটি উঁচু হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।

অলিভারকে পকেটমারা শেখাবার জন্যেও তাকে একটু তফাতে দাঁড় করিয়ে রেখে তার সঙ্গী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল -তারপর চকিতের মধ্যে তাঁর পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে দৌড় দিলে।

ভদ্রলোক কিন্তু টের পেয়েছিলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিয়েই ঘুরে দাড়ালেন এবং দেখলেন, তার সুমুখে একটি ছোকরা যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাড়িয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছেনা। সঙ্গীর কাণ্ড দেখে অলিভার সত্যিই হতভম্ব হয়ে গিছল।

ওদিকে ওধার থেকে তার সঙ্গী তাকে ইসারা করে ডাকতে লাগল। অলিভার তখন ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল, চোর, চোর, ধর, ধর। অনেকগুলো লোক তার পিছনে ছুটতে লাগল। কতকগুলো কুকুরও সেই সঙ্গে ছুটলো।

অতগুলো যোয়ান লোক, তাদের সঙ্গে আবার কুকুর। বেচারা অলিভার তাদের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? কিছুদূর গিয়েই সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো এসে তাকে চেপে ধরল।

পুলিশ। পুলিশ!

মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ এসে হাজির। সহজ ব্যাপার নয়। একটা চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে! অতএব চল একেবারে ম্যাজিসট্রেটের কাছে।

তারা অলিভারকে টানতে টানতে কাছাকাছি থানায় নিয়ে গিয়ে ম্যাজিসট্রেটের কাছে হাজির করল। যাঁর টাকা চুরি গিয়েছিল তিনিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের নাম মিঃ ব্রাউনলো। সদাশয় মানুষ তিনি। অলিভারের অবস্থা দেখে তাঁর

মনে করুণা জাগল। তার সরল নিষ্পাপ মুখ দেখে তিনি বুঝলেন, এ ছেলে চুরি করেনি। তিনি ম্যাজিসট্রেটকে বললেন, মামলা তিনি করতে চান না, ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু বদমেজাজী হাকিম তাঁর কথা শুনে তাঁকে এক প্রচণ্ড ধমক দিলেন, তারপর অলিভারকে ফাটকে দেবার হুকুম জারী করলেন।

শেষ পর্যন্ত অলিভারকে ফাটকে যেতে হল না। হাকিমকে হুকুম পাল্টাতে হল। কারণ যে-বই-এর দোকানের সামনে মিঃ ব্রাউনলোর টাকা চুরি গিয়েছিল সেই দোকানের মালিক শেষ মূহূর্তে এসে সাক্ষ্য দিলেন যে অলিভার নিরপরাধ, অন্য একটি ছোকরাকে পকেট মেরে টাকার ব্যাগ নিয়ে ছুটে যেতে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন।

এরপর তো আর তাকে হাজতে পাঠানো চলে না। অগত্যা হাকিম অলিভারকে মুক্তি দিলেন।

॥ তিন ॥

অলিভারের অবস্থা দেখে আর তার কথা শুনে মিঃ ব্রাউনলোর বড় মায়া হল। বেচারা ধুঁকছে, হাঁটতে পারছে না। টলে পড়ছে। তিনি তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন, তারপর তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তাকে চাঙ্গা করে তুললেন।

অলিভার যেন নতুন জীবন পেল।

মিঃ ব্রাউনলোর সংসারে কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। তিনি ছিলেন অকৃতদার। বাড়ীতে ছিল এক পুরাতন পরিচারিকা। সে-স্ত্রীলোকটিও বিশেষ দয়াবতী ছিল। সে বিশেষ স্নেহ-যত্নের সঙ্গে অলিভারের দেখা-শোনা করতে লাগল।

অলিভার তার ভাগ্যতাড়িত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা সমস্তই মিঃ ব্রাউনলোকে জানিয়েছিল। তার সরল নিষ্পাপ মনের পরিচয়

পেয়ে মিঃ ব্রাউনলো তাকে ভালবাসতে লাগলেন, প্রত্যহ তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে লাগলেন, তার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরম সুখে দিন কাটতে লাগল। তার জন্যে তার আশ্রয়-দাতা কোন কিছুরই অভাব রাখলেন না।

কিন্তু এত সুখ তার ভাগ্যে সইল না। একদিন এমন এক ঘটনা সহসা ঘটে গেল যাতে তার জীবনের গতি আবার বদলে গেল এবং সে আবার দুঃখ-দুর্দশার আবর্তের মধ্যে পড়ল।

মিঃ ব্রাউনলোর একটি বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম মিঃ গ্রিমউইগ। ভদ্রলোক কারুর মধ্যেই ভাল কিছু দেখতে পেতেন না, সকলকারই দোষ দেখে বেড়াতেন। একদিন দুই বন্ধুতে বসে গল্প করছেন এমন সময় অলিভারের কথা উঠলো। অলিভার যে সৎ, নিস্পাপ, সরল, তা মিঃ গ্রিমউইগ বিশ্বাস করলেন না। অলিভার সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউনলোর সুখ্যাতির প্রতিবাদ করে বললেন, আরে, রেখে দাও তোমার ছেলেটার সাধুতার কথা। আমি বলছি, ও একটা চোর, সুবিধে পেলেই আবার চুরি করবে।

মাথা নেড়ে মিঃ ব্রাউনলো বললেন, তুমি ভুল করছ। অলিভার সে রকম ছেলে নয়।

মিঃ গ্রিমউইগের কিন্তু সেই এক কথা, ছেলেটা কখনই ভাল নয়।

দু'জনে রীতিমত তর্ক শুরু করলেন। শেষে মিঃ গ্রিমউইগ বললেন, বেশ, একটা পরীক্ষা করে দেখ। ওকে একদিন একটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বাজারে পাঠাও, দেখবে, ও আর ফিরবে না।

মিঃ ব্রাউনলোর জেদ চেপে গেল, বললেন, একদিন কেন, ওকে আমি এখনি একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বাজারে পাঠাচ্ছি। তুমি দেখবে, তোমার ধারণা একদম ভুল।

এই বলে তিনি অলিভারকে ডেকে তার হাতে একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বললেন, সেদিন যে বই-এর দোকান থেকে বই কিনেছিলাম সেই দোকানে যা। আমি কয়েকখানা বই বেছে রেখে

এসেছি, নোটখানা দোকানিকে দিয়ে বইগুলো নিয়ে আয়। শিগগির আসবি, দেরী না হয়। যেতে আসতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

অলিভার বললে, আমি এক ছুটে যাব আর আসব।

এই বলে সে মহানন্দে টাকা নিয়ে চলে গেল। মিঃ ব্রাউনলো বললেন, ও ঠিক মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসবে, দেখে নিও।

মিঃ ব্রাউনলো বন্ধুর সামনে তাঁর ঘড়ি বার করে রাখলেন। সময় কাটতে লাগল। পনেরো মিনিট গেল, তারপর আধঘণ্টা, ক্রমে এক ঘণ্টা, এমন কি দু'ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু অলিভার ফিরে এলো না।

॥ চার ॥

অলিভার কেন ফিরে এলো না তার কারণ জানতে হলে কিছু পিছনকার কাহিনী বলা প্রয়োজন।

অলিভারের বাবার নাম ছিল এডওয়ার্ড লীফোর্ড। তিনি এক সময় সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পরে অনেক টাকা নষ্ট করে বিদেশে চলে যান।

তিনি প্রথমে যাকে বিবাহ করেন তার গর্ভে মঙ্ক নামে একটি পুত্র হয়। তারপর অনেকদিন বাদে তিনি গোপনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। অলিভার পিতার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর সন্তান।

অলিভার যখন মাতৃগর্ভে সেই সময় লীফোর্ড হঠাৎ মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মঙ্ক-কে অলিভারের কথা বলে যান এবং নির্দেশ দিয়ে যান, তার বিমাতার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে মঙ্ক যেন তাকে লালন-পালন করে এবং সে বড় হলে যেন তাকে বিষয়ের অর্ধেক ভাগ দেয়।

অলিভারের মাও স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যান। তারপর হঠাৎ স্বামী একদিন চলে গেলেন এবং তাঁর আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া

গেল না। এদিকে মহিলাটির হাতে পয়সাকড়িও কিছু ছিল না। উপরন্তু তিনি সন্তানসম্ভবা।

এই অবস্থায় কষ্টে কিছু কাল বিদেশে কাটিয়ে তিনি কোন রকমে দেশে ফিরলেন। কিন্তু কোথায় আশ্রয়? পথের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একজন পল্লীবাসী দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে এক অনাথ আশ্রমে দিয়ে এলেন। সেখানে অলিভার ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি মারা গেলেন।

লীফোর্ড তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা আর একজনকে বলে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ ব্রাউনলো। শুধু বলে যান নি, লীফোর্ড তাঁর বন্ধুকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি ছবিও দেখিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন, মিঃ ব্রাউনলো যেন অভাগিনী রমনীর খোঁজখবর নেন।

লীফোর্ড মারা যাবার পর মিঃ ব্রাউনলো তাঁর বন্ধুর স্ত্রীর অনেক খোঁজ করলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। হয়ত অলিভারকে দেখে তার মুখে ছবিতে দেখা সেই রমনীর মুখের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই মিঃ ব্রাউনলো অলিভারের প্রতি অতখানি স্নেহপ্রবণ হয়েছিলেন।

মঙ্ক ছোকরাটি অতিশয় বদ। সে চায়নি যে তার বিমাতা বা তার কোন সন্তান তাদের বাড়িতে আসে বা বিষয়ের ভাগ পায়। সে বরাবরই অলিভারের মা—তারপর অলিভারের গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল। তাই অলিভার যখন মিঃ ব্রাউনলোর কাছে আশ্রয় পেল তখন মঙ্ক বিশেষ দুর্ভাবনায় পড়ল। যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে তো অলিভারকে বিষয়ের অংশ দিতে হবে? না, তা কোন মতেই ঘটতে দেওয়া হবে না। অলিভারকে মিঃ ব্রাউনলোর কাছ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। যেমন করে হোক।

এই রকম চিন্তা করে মঙ্ক গেল ফ্যাগিনের কাছে। যেমন করে হোক ফ্যাগিন তাকে ফিরিয়ে আনুক, তাকে পাকা চোর তৈরী করুক,

তাহলে মঙ্কের দুর্ভাবনা থাকে না। মঙ্ক ফ্যাগিনকে বললে, এই কাজ হাঁসিল করতে পারলে মঙ্ক তাকে প্রচুর টাকা দেবে।

ফ্যাগিন তো এই চায়। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল এবং বিল নামে তার এক দুর্দান্ত অনুচর আর তার স্ত্রী ন্যান্সীকে এই কাজে নিযুক্ত করল॥

সেদিন টাকা নিয়ে বইএর দোকানে গিয়ে বইএর প্যাকেটটা নিয়ে অলিভার দোকান থেকে বেরিয়েছে এমন সময় সে বিল আর ন্যান্সির খপ্পরে পড়ল।

বিল ও ন্যান্সি নানা কৌশল করে তাকে ধরে নিয়ে গেল। অলিভার বিস্তর চেষ্টা করল, অনেক কাকুতি মিনতি করল কিন্তু কিছুতেই তাদের হাত থেকে ছাড়ান পেল না।

কিছুদিন তাকে ফ্যাগিনের বাড়ির মধ্যে একটা চোর কুঠরিতে লুকিয়ে রাখা হল। তারপর একদিন তাকে নিয়ে বিল একটা বাড়ীতে চুরি করতে গেল। তাকে পাকা চোর তৈরী করতে হবে তো!

বেরুবার আগে বিল তাকে ভয় দেখিয়ে বললে, যদি সে পালাবার চেষ্টা করে বা গোলমাল করে তাহলে তাকে খুন করে ফেলা হবে। অলিভার ভয়ে ভয়ে বিলের সঙ্গে গেল।

মাঝরাতে তারা সেই বাড়ির কাছে পৌছলো। অলিভার ছিল রোগা ছিপছিপে। অতএব তাকে একটা শার্শি গলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে না। স্থির হল, সে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাড়ির সদর দরজা খুলে দেবে। তাহলে বিল সহজেই তার কাজ উদ্ধার করতে পারবে।

অলিভার প্রথমটা চুপচাপ বিলের নির্দেশ মতো কাজ করল। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে সদর দরজা খুলে না দিয়ে সে 'চোর, চোর' বলে চেঁচাতে লাগল। তাই দেখে ক্রোধে ক্ষেপে উঠে বিল জানলা দিয়ে তাকে গুলি করে সরে পড়ল।

অলিভারের চিৎকারে আর গুলির আওয়াজে লোকজন জেগে

উঠল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তারা অজ্ঞান অচৈতন্য অলিভারকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে তাকে অন্দর মহলে নিয়ে গেল। সেখানে ছিলেন বিধবা গৃহকর্ত্রী আর তাঁর ভাইঝি মিস্ মেইলি।

আহত অলিভারকে দেখে দয়াবতী মিস মেইলির মন মমতায় ভরে উঠল। তিনি পুলিশ ডাকতে নিষেধ করলেন এবং নিজে অলিভারের চিকিৎসার ভার নিলেন।

আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি। অলিভার সেরে উঠল এবং প্রথম সুযোগেই মিস মেইলির কাছে নিজের জীবনের কাহিনী বললে। মিস মেইলি তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করলেন এবং পরম স্নেহে অলিভারকে নিজের কাছে রাখলেন। অলিভার আবার আশ্রয় পেল

॥ পাঁচ ॥

এদিকে মঙ্ক কিন্তু নিশ্চেষ্ট ছিল না। পুনরায় ফ্যাগিন ও বিলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। কী উপায়ে আবার অলিভারকে চুরি করে আনা যায় সে সম্বন্ধে তারা নানা আলোচনা করতে লাগল।

একদিন বিলের স্ত্রী ন্যান্সি তাদের নতুন ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেল। শুনে তার মনটা খুব খারাপ হোয়ে গেল। আহা, বেচারা ছেলেটা তো কোন অপরাধ করেনি, অনর্থক তার জীবনটাকে নষ্ট করবার জন্য কেন এই চক্রান্ত ?

কুসংসর্গে থাকলেও ন্যান্সির মনটা ছিল অন্য রকম। সে স্থির করল, এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

সুযোগ বুঝে সে গোপনে মিস মেইলির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা জানাল এবং সেই সঙ্গে অলিভারের আসল পরিচয়ও তাঁর কাছে প্রকাশ করে দিলে।

বিল কি করে জানতে পারল, ন্যান্‌সি পর পর দু'তিনদিন মিঃ মেইলির বাড়ি গিয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সে ন্যান্‌সিকে খুন করে ফেললে, তারপর ধরা পরবার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

একদিন একটা বাড়ির ছাদ থেকে সে দড়ি বেয়ে নামছিল। নামতে নামতে বেকায়দায় পরে সেই দড়ি তার গলার জড়িয়ে গেল এবং সেই দড়ির ফাঁসে গলা আটকে ঝুলন্ত অবস্থায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বিল মারা গেল।

ন্যান্‌সির কাছ থেকে অলিভারের আসল পরিচয় পেয়ে মিস মেইলি অবিলম্বে মিঃ ব্রাউনলোকে খুঁজে বার করে তাঁকে সব কথা বললেন।

মিঃ ব্রাউনলো শুধু যে বন্ধু-পুত্রকে ফিরে পেলেন তাই না, তার সততারও অভ্রান্ত প্রমান পেলেন।

মিঃ গ্রিমউইগও ব্যাপার শুনে আনন্দ করতে লাগলেন। তিনি মিস মেইলিকে বারবার অশীর্বাদ করতে লাগলেন। আহা, বেচারা ছেলেটা তো তাঁরই জন্যে এমনধারা বিপদে পড়েছিল। তাই মিঃ গ্রিমউইগের আনন্দই যেন সবচেয়ে বেশী।

ফ্যাগিনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তার বিচার হল। মামলার সময় জানা গেল, ফ্যাগিন নানা প্রকার গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বিচারে তার ফাঁসী হয়ে গেল।

মঙ্ক যখন শুনল যে তাকেও পুলিশে দেওয়া হবে তখন সে মিঃ ব্রাউনলোর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল এবং অলিভারকে তার প্রাপ্য বিষয় ও টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিতে স্বীকৃত হল।

অতঃপর অলিভার মিঃ ব্রাউনলোর কাছে থেকে পরম সুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগল।